পা রাখার জায়গা

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী / কলকাতা-৯

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে

এক

কলকাতা তো সারাক্ষণ উত্তেজনায় গরগর করতে থাকে। যখন-তখন রাগে ফেটেও পড়ে। এখানে দম-আটকানো ভিড়। চারিদিকে থিকথিক করছে মানুষ। যে-কোনও অছিলায় মিছিল, অবরোধ। স্লোগানে, চিৎকারে আকাশ চৌচির হয়ে যায়। ধুলোয়, হাজার হাজার বাস অটো মিনিবাস এবং প্রাইভেট কারের পোড়া গ্যাসোলিনের ধোঁয়ায় মাথার ওপর দু' কিলোমিটার অবধি ঝাপসা হয়ে থাকে। মহানগর যেন শ্বাসকষ্টের রোগী; দিবারাত্রি ধুঁকছে।

আশ্চর্য, এই কলকাতারই এক কোনায় ছোট্ট দ্বীপের মতো শান্ত আর নিরিবিলি একটা এলাকা আছে যার নাম 'নিউ আইল্যাণ্ড'। এখানে মানুষজন কম, অটো-বাস-টাসের উৎপাত নেই। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে থাকে না। যেদিকেই তাকানো যায়—পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে। হইচই, হল্লা কানে আসে না। টাটকা, সতেজ বাতাস বয়ে যায় বারো মাস। এখানে এলে চোখ জুড়োয়।

'নিউ আইল্যাণ্ড'-এর একধারে সাততলা বিল্ডিংটার নাম 'মৈনাক'। সেটার টপ ফ্লোরে পনেরো শো স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাটে একাই থাকেন মনোবীণা লাহিড়ি। এটাই তাঁর স্থায়ী বাসস্থান।

ফ্ল্যাটটার অনেকটা জায়গা জুড়ে কার্পেটে-মোড়া হল-ঘর। তার একপাশে ড্রইংরুম। সেখানে রয়েছে দু'সেট সোফা, দু'টো গ্লাস-টপ সেন্টার টেবল। একটা দোতলা স্ট্যান্ডের ওপর টিভি, তার তলায় মেরুন রংয়ের টেলিফোন, প্রচুর গানের ক্যাসেট। আরেক প্রান্তে ডাইনিং টেবল ঘিরে আটটা গদিমোড়া চেয়ার। এক দেওয়ালে ওয়াল-ক্লক। অন্য দুই দেওয়াল ঘেঁষে বুক-সমান হাইটের কাচের পাল্লা বসানো বইয়ের র‍্যাক। র‍্যাকগুলোর মাথায় নানা ধরনের কিউরিও।

ফ্ল্যাটটার দক্ষিণ দিকের পুরো দেওয়াল জুড়ে কাচের জানালা। তার বাইরে প্রায় সত্তর ফিট নীচে একটা ঝকঝকে রাস্তা। রাস্তার পর মস্ত পার্ক। সেখানে প্রচুর গাছপালা, তীব্র-সবুজ ঘাস। সারাদিন গাছগাছালির মাথায় অজস্র পাখি ওড়ে। কলকাতায় যে এত পাখি আছে এখানে না এলে জানা যায় না। পার্কটা আধখানা বৃত্তের আকারে অনেকটা ঘুরে দক্ষিণ থেকে পুব দিকে চলে গেছে। তাই ওই দু'টো দিক বহু দূর অবধি খোলামেলা। উত্তরে ছোটোখাটো আদ্যিকালের বেশ কিছু একতলা কি দোতলা বাড়িঘর। যতদিন না ওগুলো ভেঙেচুরে প্রোমোটাররা আকাশছোঁয়া হাই-রাইজ তুলছে, মনোবীণা লাহিড়ির সাততলার ফ্ল্যাট থেকে এক-দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যাবে, কোথাও বাধা পাবে না।

পুব, দক্ষিণ আর উত্তর দিক বাধাবন্ধহীন কিন্তু পশ্চিম দিকটায় হল-ঘরেব নিরেট দেওয়াল। সেই দেওয়ালে বাইরে যাতায়াতের জন্য কারুকাজ-করা মস্ত দরজা। দরজা খুললে চওড়া করিডর, সেটার ওধারে মুখোমুখি অন্য একটা ফ্ল্যাট।

এই বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোর জুড়ে গ্যারাজ। পেছন দিকের কমপাউন্ড-ওয়াল ঘেঁষে সারি সারি সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স। যারা এখানে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কাজকর্ম করে, তাদের কেউ কেউ ওখানে থাকে, বাকি সবাই কাজ শেষ হলে চলে যায়, আবার পরের দিন সকাল হতে না হতেই চলে আসে।

গ্রাউন্ড ফ্লোর বাদ দিলে ওপরের ছ'টা ফ্লোরের প্রতিটিতে দু'টো করে ফ্ল্যাট। সব মিলিয়ে বারোটি। সবগুলোই সমান মাপের—পনেরো শো স্কোয়ার ফিট।

মনোবীণা হল-ঘরে সোফায় বসে ছিলেন। তাঁর সামনের সেন্টার টেবিলে একটি খোলা ফাইল।

আজ রবিবার। দশটা বাজতে এখনও সাত মিনিট বাকি। মনোবীণা অচেনা একটি তরুণীকে, যার নাম পারমিতা দত্ত, চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সে এসে যেন দেখা করে। মনোবীণা খুবই নিয়মানুবর্তী, সময়ের এতটুকু হেরফের হলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হেলেদুলে

দশটার পর মেয়েটা যদি এসে হাজির হয়, তাকে ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। বাইরের দরজা থেকেই বিদায় করা হবে।

হল-ঘরের বাঁ দিকের শেষ মাথায় কিচেন। অন্য পাশে পরপর তিনটে বেডরুম। মনোবীণা একা মানুষ। একটা বেডরুমেই তাঁর চ'লে যায়, বাকি দু'টো ফাঁকা পড়ে থাকে।

মনোবীণার বয়স আটষট্টি। একটা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়ে কয়েক বছর আগে রিটায়ার করেছেন। একমাত্র ছেলে থাকে আমেরিকায়। এ ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর আর কেউ নেই।

বয়স তো কম হল না। নানা রোগে ধরেছে মনোবীণাকে। হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে হাড়ের সমস্যা, হার্টের গোলমাল। অসুখ কি একটা-দু'টো? শরীরের হাল যেমনই হোক, মেজাজ সারাক্ষণ চড়া তারে বাঁধা থাকে।

দু'জন কাজের লোক মনোবীণার। আরতি আর মাধব। আরতির কাজ হল রান্নাবান্না এবং বাসনকোসন মাজা। মাধব ঘরদোর ধোয় মোছে, বাজার করে, টেলিফোনের বিল, ইলেকট্রিসিটির বিল জমা দেয়, পোস্ট অফিসে ছোটে। এসব ছাড়াও নানা ফাইফরমাশ খাটে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা, চেক জমা দেওয়া বা পেনশন আনা—এসব নিজেই করে থাকেন মনোবীণা। বাড়ির বাইরে গেলে মাধবকে সঙ্গে নেন।

বেশ ক'বছর ধরে আরতি আর মাধব কাজ করছে। আটটার মধ্যে তারা চলে আসে। যায় সন্ধেবেলায়। সকাল এবং দুপুরে দু'জনে এখানেই খায়। রাতের খাবারটা টিফিন-ক্যারিয়ারে ভরে নিয়ে চলে যায়।

আরতিরা সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্সে থাকে না। আরতি থাকে কাছাকাছি বস্তি ধরনের একটা জায়গায়। মাধব আরও খানিকটা দূরে।

যদিও শরীরটা নানা রোগের আস্তানা, রাত্তিরে কোনও একজনের ফ্ল্যাটে থাকা দরকার, কেননা হঠাৎ অসুস্থতা বাড়লে ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনতে ছোটা, এসব কে করবে? মাধব আর আরতি খুবই বিশ্বাসী। চারিদিকে জামাকাপড়, দামি দামি সব জিনিস, টেবিলের খোলা দেরাজে টাকাপয়সা পড়ে থাকে কিন্তু কোনওদিন একটা ঘষা পয়সাও খোয়া যায়নি। এক-এক সময় মনোবীণা ভাবেন, ওদের কারুকে বলবেন রাত্তিরে তাঁর কাছে থেকে

যেত। কিন্তু পরক্ষণে খেয়াল হয় আরতি আর মাধবের ঘরসংসার রয়েছে। সেসব ফেলে থাকা সম্ভব নয়।

এই তো ক'দিন আগে হঠাৎ মাঝরাতে বুকে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল, সরবিট্রেট খেয়ে কোনওরকমে ব্যথাটা সামলানো গেছে। কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন মনোবীণা। তাই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, একজন অল্পবয়সি সঙ্গিনী চান। সারাদিন তো আরতিরা থাকে, তখন সমস্যা নেই। কিন্তু রাত্তিরে এমন একজনকে দরকার যে হবে মিষ্টভাষী, ঝাড়া হাত-পা, সহানুভূতিশীল। আরও কিছু কিছু শর্তও আছে। সেসব সামনাসামনি বসে আলোচনা করে স্থির করা হবে। যাকে মনোনীত করা হবে তাকে অ্যাটাচড বাথওয়ালা একটি ঘর দেওয়া হবে। ইচ্ছা করলে সে দিনের বেলা বাইরে অন্য কাজ করতে পারে। কিন্তু সন্ধের পর থেকে পরদিন সকাল অবধি ফ্ল্যাটে থাকাটা বাধ্যতামূলক। পছন্দসই তরুণীটিকে রাত জাগতে হবে না। তবে মনোবীণার অসুস্থতা যদি আচমকা বেড়ে যায় তখন না জেগে পারা যাবে না। সেই সময় কী কী করতে হবে, আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে। খাওয়া-দাওয়া ফ্রি। তবে আস্ত একটি ঘরের জন্য কিছু ভাড়া নেবেন মনোবীণা। খানিকটা পেয়িং গেস্ট, খানিকটা কম্পেনিয়ন—মোটামুটি এইরকম একটা ব্যাপার। প্রতিটি প্রার্থীকে আবেদনের সঙ্গে 'লেটেস্ট' দু'কপি করে ফোটো পাঠাতে হবে। দরখাস্ত করতে হবে খবরের কাগজের পোস্টবক্সে।

শ'খানেক প্রার্থী চিঠি পাঠিয়েছিল। তার ভেতর থেকে পাঁচজনকে বেছে নিয়েছেন মনোবীণা। আজ চার নম্বর ক্যান্ডিডেটকে আসতে বলা হয়েছে, যার নাম পারমিতা দত্ত।

কিচেন থেকে ঠুং ঠাং, ছ্যাঁকছোঁক, নানা ধরনের আওয়াজ আসছে। অর্থাৎ আরতি পুরোদমে রান্না চালিয়ে যাচ্ছে। নানারকম শব্দ করে পুব দিকের বেডরুমটা ঝাড়পোঁছ করছে মাধব।

দশটা বাজতে যখন দু'মিনিট বাকি সেই সময়ে ডোর-বেল বেজে ওঠে।

মাধবকে কিছু বলতে হয় না; বেল বেজে উঠলেই সে দৌড়ে যায়। এখনও তার হেরফের হল না। হাতের কাজ স্থগিত রেখে ক্ষিপ্র পায়ে সে গিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে দিল।

মনোবীণা লক্ষ করছিলেন। তাঁর চোখে পড়ল খোলা দরজার বাইরে সালোয়ার কামিজ পরা একটি সুশ্রী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। সে মাধবকে বলছিল, 'আমার নাম পারমিতা। মনোবীণা লাহিড়ি আমাকে আজ দশটায় এখানে আসার জন্যে চিঠি লিখেছেন।'

মাধব কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, মনোবীণা বললেন, 'ওকে এখানে আসতে দে।'

পারমিতা হল-ঘরে ঢুকে মনোবীণার সামনে চলে আসে। ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রণাম-ট্রণামের সেকেলে প্রথার ধার ধারে না। কেমন যেন দুর্বিনীত, উদ্ধত। কিন্তু পারমিতা অন্য ধরনের মেয়ে; বড়দের শ্রদ্ধা করতে জানে। প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মনোবীণা লাহিড়ির ভালো লাগল। কয়েক পলক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। সাজগোজ, পোশাকে উগ্রতা নেই; বেশ শালীনতা রয়েছে। নরম গলায় বললেন, 'আমার চেয়ে তুমি অনেক ছোট। তুমি করেই বলছি। বোসো।'

পারমিতাকে দেখলে অল্পবয়সি মনে হয়। বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। আসলে তার বয়স একত্রিশ। আবেদনপত্রে সে তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে; গোপন করেনি।

মনোবীণার মুখোমুখি একটা সোফায় একটু যেন ভয়ে ভয়ে, নাকি সন্তর্পণে বসে পড়ল পারমিতা। তাকে শুধু সুশ্রী বললে ঠিক বলা হয় না; বেশ সুন্দরী। তবে সতেজ, স্বচ্ছন্দ ভাবটা প্রায় নেই। কেমন যেন আড়ষ্ট। খুঁটিয়ে দেখলে তার চোখেমুখে দুর্ভাবনার একটা ছাপ চোখে পড়বে। ভেতরে ভেতরে কোথাও বুঝি বা চাপা টেনশন রয়েছে।

পারমিতা বলল, 'তুমি করেই তো বলবেন। সব দিক থেকেই আপনি আমার চেয়ে কত বড়। আমাকে আপনি করে বললে ভীষণ অস্বস্তি হবে।'

একটু নীরবতা।

তারপর মনোবীণা বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু জানিয়েছ। আমি ডিটেলে আরও জানতে চাই।'

পারমিতার শরীরে সামান্য ঝাঁকুনি লাগল যেন। সারা মুখে ভয়ের ছায়া

পড়েই চকিতে মিলিয়ে গেল। মনোবীণার দিকে তাকিয়ে সে অপেক্ষা করতে থাকে; কোনও প্রশ্ন করে না।

মনোবীণা পারমিতার দিক থেকে চোখ সরাননি। প্রায় বেয়াল্লিশ বছর মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছেন। তাঁর হাত দিয়ে হাজার হাজার ছাত্রী বেরিয়েছে। কোনও মেয়ের দিকে তাকালে তার বুকের গভীর তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পান। মনোবীণার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। তাঁর সঙ্গে কারচুপি করে কেউ আজ অবধি পার পায়নি। বললেন, 'তুমি লিখেছ, তোমার কোনওরকম পিছুটান নেই। এই বিষয়টা পরিষ্কার করে বল।'

পারমিতা বলল, 'আমার মা-বাবা কয়েক বছর হল মারা গেছেন। একমাত্র দাদা থাকে চেন্নাইতে। তার কলিগ একটি তামিল মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই ফ্ল্যাট কিনে পার্মানেন্টলি থেকে গেছে। আমার কোনও খোঁজখবর নেয় না।'

'তোমার বয়েস লিখেছ একত্রিশ। জিগ্যেস করা হয়তো ঠিক নয় তবু জানতে চাইছি তোমার বিয়ে হয়নি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পারমিতা। তারপর চাপা গলায় বলল, 'হয়েছিল।'

মনোবীণার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।—'সেই বিয়ের কী হল? মানে—' বলতে বলতে থেমে গেলেন।

তাঁর জিজ্ঞাস্য কী, বুঝতে অসুবিধা হল না পারমিতার। চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে সে যা বলল তা এইরকম। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সমরেশকে। তখন পারমিতার বয়স তেইশ, বাবা মারা গেছেন, মা ক্যানসারে ভুগছেন। দাদা চেন্নাইতে। এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে সমরেশের সঙ্গে আলাপ। সেও নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিল। সপ্রতিভ, ঝকঝকে যুবক সমরেশ, চমৎকার কথা বলতে পারত। পারমিতা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আলাপটা বন্ধুর বিয়ের দিনই শেষ হয়ে যায়নি। পরেও তাদের দেখা হতে লাগল। তারপর তিনমাসের মধ্যে তাদের বিয়ে। মায়ের আয়ু তখন ফুরিয়ে এসেছে। পারমিতাকে নিয়ে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা ছিল। ছেলে দেখে না, স্বামী নেই। তাঁর মৃত্যুর পর কী হবে মেয়েটার? বিয়েটা হয়ে যাওয়ায় খুশি হয়েছিলেন তিনি। সব দুর্ভাবনার অবসান ঘটেছিল। পারমিতার বিয়ের মাস দুই পর তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্বশুরবাড়িতে এসে ঘোরের মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছিল। যেন এক স্বপ্নের উড়ানে পারমিতা ভেসে বেড়াচ্ছিল। সমরেশদের ছোট্ট পরিবার। বাবা, মা আর ছেলে। বাবা অবণীভূষণ ছিলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মস্ত অফিসার। নিরীহ, নির্বিবাদী, অন্তর্মুখী মানুষ। সংসারের বা জাগতিক কোনও ঘোরপ্যাঁচে থাকতেন না। পারমিতার বিয়ের বছরেই রিটায়ার করেন। এমনিতে দুর্দান্ত পড়ুয়া। চাকরি জীবনে যেটুকু সময় পেতেন নানা বিষয়ের বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন। অবসর নেবার পর হাতে অফুরন্ত অবসর। বই ছাড়া অন্য কোনও দিকে তাকাতেন না। তবে শ্বাশুড়ির দাপট ছিল প্রচণ্ড। সমরেশদের পরিবারটাকে একরকম মাতৃতান্ত্রিক বলা চলে। শাশুড়ি —যাঁর নাম স্মৃতিরেখা বসু—সংসারটাকে আঙুলের ডগায় তুলে নিয়েছিলেন। অভিজাত বংশের মেয়ে; পারমিতা যখন তাঁকে প্রথম দেখে তখন তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। সেই বয়সেও তাঁর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যেত। খুবই মেধাবী ছাত্রী ছিলেন, এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস। বাপের বাড়ি থেকে অগাধ টাকা আর বনেদি মেজাজ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পা রেখেছিলেন। মেজাজটা সবসময় চড়া তারে বাঁধা থাকত। স্বামী, কাজের লোকজন, কারও টুঁ শব্দটি করার সাহস ছিল না। সংসারে তাঁর কথাই শেষ কথা, তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি যেভাবে চালাতেন, সংসার ঠিক সেভাবেই চলত। কিন্তু ছেলের ব্যাপারে ছিলেন একেবারে অন্ধ। সমরেশের কোনও দোষত্রুটিই তাঁর চোখে পড়ত না। তাঁর কাছে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একদিকে, ছেলে আরেক দিকে।

পারমিতার মতো সাদামাঠা মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা মেয়েকে সমরেশ পছন্দ করে বিয়ে করবে, এটা আদৌ মেনে নিতে পারেননি স্মৃতিরেখা। যেহেতু ছেলে কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসেছে, তাই বাধাও দেননি। কারণ সেই অনন্ত মাতৃস্নেহ। তবে পারমিতার দিকে যখনই তাকাতেন, ভুরু কুঁচকে থাকত। সারাক্ষণ গজগজ। 'সহবত জানো না', 'গেঁয়ো রুচি', 'অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির পক্ষে অচল', 'শিক্ষাদীক্ষাও তেমনি, পাসকোর্সের গ্রাজুয়েট' ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়ে যেত পারমিতার। কিন্তু এইসব চোখা চোখা খোঁচাগুলো তেমনভাবে তার বুকে হুল ফোটাতে পারেনি। কেননা তার জোরের একটা জায়গা ছিল— সেটা হল সমরেশ। পারমিতা তখন সমরেশে বুঁদ হয়ে আছে।

সমরেশের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সেই যে সে স্বপ্নের উড়ানে উঠেছিল তারপর দেড় বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল। আর ঠিক এই সময়ই টের পাওয়া গেল সমরেশের একটা মুখই সে দেখেছে। সেই মুখের আড়ালে গোপন আরও একটা চেহারা যে রয়েছে আগে টের পাওয়া যায়নি। ক্রমশ জানা গেল, সে দুশ্চরিত্র, লম্পট। কলেজে পড়তে পড়তেই মেয়েদের নিয়ে কত কেলেঙ্কারি যে করেছে! একটা-দু'টো মেয়ে! এর সঙ্গে দু'মাস, তার সঙ্গে ছ'মাস—এইভাবে অসংখ্য। পারমিতাকে ঝোঁকের মাথায় হুট করে বিয়ে করার পর পোষমানা সুবোধ বালক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্য? দেড় বছরের মধ্যে নেশা কেটে গেলে আবার পুরোনো খেলায় মেতে উঠেছিল সে। রাত করে বাড়ি ফিরতে লাগল, মাঝে মাঝে দু'চারদিনের জন্য উধাও হয়ে যেত। ফিরে এসে যা হোক একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করত। কোনও বার বলত, 'অফিসের কাজে হঠাৎ বাইরে যেতে হয়েছিল।' কোনও বার বলত, 'এক বন্ধু ধরে নিয়ে গেল, তাই—' তার কৈফিয়ৎটা যে কত ঠুনকো তা বুঝতে অসুবিধে হত না।

বাড়িতে অনেকদিনের পুরোনো একটা কাজের লোক ছিল—মানদা। আধাবয়সি মেয়েমানুষ। কালো, একটু ভারী ধরনের, তবে বেশ শক্তপোক্ত। খুবই বিশ্বাসী। তিনকুলে আর কেউ নেই। সমরেশদের সংসারেরই একজন হয়ে গিয়েছিল সে। এ-বাড়ির নাড়িনক্ষত্র তার জানা।

একদিন দুপুরে মানদা চুপি চুপি তার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকেই পারমিতাকে ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল তার। মানুষটা সাদাসিধে, সরল হলেও বুদ্ধিহীন নয়। 'বসু-ভিলা'র মালিকদের সঙ্গে ঝি-চাকরদের গা ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই পছন্দ করতেন না স্মৃতিরেখা। যেটুকু না বললেই নয়, তার বেশি একটা কথাও বলা চলবে না। কাজের লোক কাজের লোকই। তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা দরকার।

মানদা কিন্তু স্মৃতিরেখার নিষেধাজ্ঞা মানত না। দুপুরবেলায় ঘণ্টা দুই ঘুমনোর অভ্যাস তাঁর। সেই ফাঁকে সুড়ুৎ করে পারমিতার ঘরে ঢুকে পড়ত।

সেদিন এসে মানদা বলেছিল, 'বৌদিদি, দাদাবাবুর পুরোনো রোগ ফের চাড়া দে উটেচে। খুব সাবধান।'

বুঝতে না পেরে কয়েক পলক অবাক চোখে তাকিয়ে থাকার পর পারমিতা জিগ্যেস করেছিল, 'কীসের রোগ?'

'মেয়েমানুষের রোগ।' তার গলার স্বর এবার চাপা শুনিয়েছিল।

একটু নীরবতা।

তারপর নীচু গলাতেই মানদা মেয়েমানুষ নিয়ে সমরেশের নানা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কথা শুনিয়ে বলেছে, 'তোমার মতো এত সোন্দর বৌ পেয়েও রোগ সারল না! রাগ কোরো নি বৌদিদি, দাদাবাবু সম্পক্কে খোঁজখবর নে বে'টা (বিয়েটা) করলে ভালো করতে।' একটু থেমে গলার স্বর আরও অনেকটা নামিয়ে বলেছে, 'আমি যে তোমায় এসব কইলুম, মা ঝ্যানো টের না পায়। জানতি পারলে আমার মুন্ডু চিবোবে। তোমার মতো ভালো মানুষের জন্যি বড্ড দুঃখু হয়।'

শুধু মানদাই না, বেশ ক'টা উড়ো চিঠি আর ফোনও এসেছিল। কেউ তাদের নাম-টাম জানায়নি। শুধু বলেছে ওরা তার শুভাকাঙ্ক্ষী। কোন কোন মেয়ের সঙ্গে সমরেশ কী করে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝেই সেসব খবর তারা দিত।

একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল পারমিতা। সে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে এসেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কী ধরনের হওয়া উচিত সে ব্যাপারে বদ্ধমূল কিছু ধারণা তার আছে। কোনও স্ত্রী অন্য পুরুষে আসক্ত হবে কিংবা স্বামী অন্য মেয়েদের নিয়ে উড়ে বেড়াবে, তা সে ভাবতেই পারে না। এটা একরকম আজন্মের সংস্কারই বলা চলে। সমরেশকে সে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু বৃথাই। প্রথম প্রথম সে কোনও উত্তর দিত না। পরে খুব ঠান্ডা গলায় বলেছে, 'তুমি বাড়িতে যেমন আছ তেমনি থাকো। বাইরে আমি কী করছি, না-করছি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

যাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছে, যার ওপর ছিল অনন্ত নির্ভরতা সে যে এমন হৃদয়হীন, এতখানি ইতর, ঘুণাক্ষরেও আগে টের পাওয়া যায়নি।

নিরুপায় পারমিতা শেষ পর্যন্ত শাশুড়ির কাছে ছুটে গিয়েছিল। সব শুনে স্মৃতিরেখা বলেছেন, 'হ্যাঁ, এটা বাবুনের একটা ডিজিজ বলতে পার। মানুষের জ্বরজারি সর্দিকাশি হয় না, এটা সেইরকম আর কি।'

রোগের কথাটা মানদা আগেই বলেছিল কিন্তু তার বলার মধ্যে উৎকণ্ঠা মেশানো ছিল, কিন্তু স্মৃতিরেখা যেভাবে হেলাফেলা করে কথাগুলো বলেছেন তাতে মনে হয়েছে, ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ। অত্যন্ত সাধারণ গোছের।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল পারমিতা। তার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল যেন। কী উত্তর দেবে, ভেবে উঠতে পারছিল না।

স্মৃতিরেখা তার মনোভাব হয়তো খানিকটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন। চোখ সরু করে এবার বলেছেন, 'স্বামীর স্বভাবে যদি কোনও দোষ-টোষ থাকে সেটা শোধরাবার দায়িত্ব তোমার। সতীসাধ্বীরা তো তাই করে থাকে। আমার কাছে এ নিয়ে আর ঘ্যান ঘ্যান করতে এস না।'

হঠাৎ যেন দুঃসাহস ভর করেছিল পারমিতার মাথায়। ব্যাকুলভাবে বলেছিল, 'কিন্তু আপনি তো মা। আপনারও তো ছেলের সম্বন্ধে একটা দায়িত্ব আছে। দয়া করে ও যে পথে চলেছে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনুন।'

মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল স্মৃতিরেখার। চোখ থেকে আগুন ছুটছিল যেন তাঁর। পলকহীন মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকার পর দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, 'তোমাকে যা বলার বলে দিয়েছি। আর একটা কথাও নয়। তুমি যেতে পার।'

এরপর আর কিছুই করার ছিল না পারমিতার। মুখ বুজে সব সয়ে যেতে হয়েছে। তারই মধ্যে তার একটি ছেলে হয়েছে—সোনা। সোনার বয়স যখন তিন সেই সময় বাড়াবাড়িটা চরমে পৌঁছে গেল। সমরেশ কলকাতার চাকরি ছেড়ে বিশাল একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ হয়ে আমেরিকায় চলে গেল। জানা গেল একটি গুজরাতি মেয়েও তার সঙ্গে ওই কোম্পানিতেই কাজ নিয়ে গেছে। মেয়েটি ম্যানেজমেন্টের দুর্দান্ত ছাত্রী এবং দারুণ সুন্দরী।

সমরেশের সঙ্গে আগেই দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। হাজার হাজার মাইল দূরের অন্য এক মহাদেশে সে চলে যাবার পর দূরত্বটা আরও লক্ষগুণ বেড়ে গেল। এরপর যা অনিবার্য একদিন তাই ঘটল। আমেরিকা থেকে সমরেশ জানাল ডিভোর্স চায়, গুজরাতি সহকর্মিণী শ্বেতাকে সে বিয়ে করবে। পারমিতা রাজি

হলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রচুর টাকা দেওয়া হবে। সমরেশ আশা করে, এ নিয়ে পারমিতা কোনওরকম আপত্তি বা অশান্তি করবে না।

শ্বশুর অবনীভূষণ বসু এই সময় পরপর দু'টো বড় রকমের স্ট্রোকে শয্যাশায়ী। ডান দিকটা পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় তাঁকে কিছু বলা না-বলা সমান। যদি সুস্থও থাকতেন, এই নিরীহ, উদাসীন, ব্যক্তিত্বহীন মানুষটি কিছু করতে পারতেন কিনা সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় আছে। অগত্যা উদ্‌ভ্রান্তের মতো স্মৃতিরেখার কাছেই পারমিতাকে যেতে হয়েছিল। বলেছিল, 'আপনার ছেলে আমাকে ডিভোর্স করতে চাইছে।'

শীতল চোখে পারমিতার দিকে তাকিয়ে স্মৃতিরেখা বলেছেন, 'জানি।'

'আপনি কিছু একটা করুন।'

'আমার কী করার আছে? তুমি নিজের স্বামীকে ধরে রাখতে পারনি, সেটা তোমার ত্রুটি। বাবুন যদি তার পছন্দমতো অন্য কোনও মেয়েকে নিয়ে সুখে থাকে তো থাক না।'

মাথায় যেন আগুন ধরে গিয়েছিল পারমিতার। সমরেশদের বাড়ি 'বসু-ভিলা'য় আসার পর প্রথম দেড়টা বছর বাদ দিলে বাকি সময়টা অপমানে, গ্লানিতে কুঁকড়ে ছিল সে। কিন্তু সেদিন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছিল। গলার শিরা ছিঁড়ে চিৎকার করে জিগ্যেস করেছিল, 'তা হলে আমার কী হবে?'

স্মৃতিরেখা বলেছেন, 'এ কী অসভ্যতা! তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, এ-বাড়িতে কেউ তোমার মতো গলা চড়িয়ে আগে কথা বলেনি।— তোমার কী হবে জানতে চাইছ? কেন, তোমাকে তো কয়েক লাখ টাকা দেওয়া হবে।'

পারমিতা গলার স্বর নামায়নি, 'একটা দুশ্চরিত্র, নোংরা, বদমাশ ছেলেকে আপনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন? নিজে মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের সর্বনাশ হচ্ছে দেখেও আপনি একটা আঙুল তুলবেন না? আমাকে কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে ডিভোর্সটা আদায় করে নিতে চাইছেন? আপনাদের আমি ঘৃণা করি। তার চেয়ে বেশি ঘৃণা করি নিজেকে। ক'টা বছর এই নরককুণ্ডে কী করে যে থাকলাম, ভাবলে মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

স্মৃতিরেখা কণ্ঠস্বর এতটুকু উঁচুতে তোলেননি। আবেগহীন, নির্মম গলায় বলেছেন, 'ইচ্ছে না হলে তুমি এ-বাড়িতে থেকো না।'

পারমিতা তখন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো সে সমানে চেঁচিয়ে গেছে, 'আর এক মুহূর্তও এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। আজই আমি চলে যাব। ডিভোর্সের জন্যে দাম দিতে হবে না। কয়েকদিন পরে এসে আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাব।'

'ছেলে তুমি পাবে না। সোনা এই বংশের সন্তান।'

'পাই কি না-পাই সেটা আমি দেখব। আমার ছেলেকে আপনারা কোনওভাবেই আটকে রাখতে পারবেন না।'

মনোবীণা লাহিড়ি পারমিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে। বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস বার করে দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস টেনে এবার জিগ্যেস করলেন, 'তুমি সত্যিই সেদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে?'

আস্তে মাথা নাড়ে পারমিতা।—'হ্যাঁ।'

'তারপর কী হল?'

পারমিতা জানায়, উত্তেজনা আর রাগের মাথায় রাস্তায় বেরিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। মা-বাবা আগেই মারা গেছেন। দাদা থেকেও নেই। কলকাতায় তাদের অল্প কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। সারাটা দিন এদের দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরেছে সে কিন্তু কোথাও একটু আশ্রয় মেলেনি। নানা অজুহাতে তারা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আসলে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ তার মতো মেয়ের দায়িত্ব নিতে চায়নি।

ঘোরাঘুরি করতে করতে সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছিল। তার মতো একটি তরুণী রাত্তিরে এই নির্বান্ধব শহরে কোথায় থাকবে, কার কাছে একটু সহানুভূতি পাবে ভেবে ভেবে ভয়ে শঙ্কায় যখন দমবন্ধ হয়ে আসছে সেইসময় তার স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বিভাবতী মৌলিকের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। খুবই স্নেহপ্রবণ মানুষ, পারমিতাকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন চিরকুমারী, স্কুল আর ছাত্রীরা ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। থাকতেন স্কুলেরই হোস্টেলে।

পারমিতা সোজা স্কুলে চলে গিয়েছিল। সেখানে জানা গেল ক'বছর আগেই রিটায়ার করেছেন বিভাবতী। এখন গুরুতর অসুস্থ, থাকেন এক ভাইপোর কাছে। ঠিকানা নিয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিল পারমিতা। বিভাবতী কতদূর কী করতে পারবেন তখন মাথায় আসেনি। খড়কুটো যা পাওয়া গেছে তাই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে সে।

সব শুনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন বিভাবতী। শুধু মৌখিক আহা-উহু নয়, প্রাক্তন ছাত্রীকে তিনি কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাইপো নিরুপম মৌলিকও হৃদয়বান মানুষ। দু'জনেই বলেছেন, যে ক'দিন ইচ্ছা পারমিতা তাঁদের কাছে থাকতে পারে।

বিভাবতীদের কাছে তিনমাস থেকে গিয়েছিল পারমিতা কিন্তু এভাবে থাকাটা যে সম্মানজনক নয় সেটা কী আর বুঝত না? বিভাবতী, নিরুপম, নিরুপমের স্ত্রী শোভনা এবং ও-বাড়ির সবাই তার দুঃখ, তার যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখতে চাইতেন। তাঁদের কথাবার্তা চমৎকার, ব্যবহার আন্তরিক, আদরযত্নের ত্রুটি নেই। ওঁদের আচরণে কখনই মনে হত না পারমিতা একজন আশ্রিতা। কিন্তু খুঁতখুঁতুনি ছিল তার মনে, সংকোচে সে স্বাভাবিক হতে পারত না, ভেতরে ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে রাখত। অজস্র ঘুণপোকা তার মাথায় যেন অবিরল তুরপুন চালিয়ে যেত। ভাবত, না, এভাবে উটকো ঝঞ্ঝাটের মতো অন্যের ঘাড়ে চেপে থেকে সারা জীবন কাটানো যায় না। কিছু একটা তাকে করতেই হবে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। তার জন্য যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হল টাকা। এবং আলাদা একটি বাসস্থান। একটা চাকরি বাকরি তাকে জোগাড় করতেই হবে, এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

বিয়ের আগেই বি. এ'টা পাশ করেছিল পারমিতা, সেই সঙ্গে কম্পিউটারের একটা কোর্সও করা ছিল। বিভাবতী এবং নিরুপমকে সে বার বার বলেছে, তাকে যেন একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।

বিভাবতী বুঝতে পারছিলেন তাঁর পুরোনো ছাত্রীটির তাঁদের কাছে থাকতে মর্যাদায় বাধছে। আত্মসম্মান বজায় রেখে সে বাঁচতে চায়। তিনি আপত্তি করেননি। কিন্তু বিভাবতী অত্যন্ত অসুস্থ, পারমিতার কাজের জন্য কাকেই বা

বলবেন। তবে নিরুপম স্টেট গভর্নমেন্টের বিরাট অফিসার; তাঁর যোগাযোগ প্রচুর। তিনিই একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন।

কাজটা পাওয়ার পর পারমিতা বেঁচে গিয়েছিল। কারও গলগ্রহ না হয়ে মাথা উঁচু করে এবার জীবন কাটিয়ে দেওয়া যাবে। বিভাবতী, নিরুপমদের ওপর অপার কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গিয়েছিল।

চাকরিতে জয়েন করার দু'সপ্তাহ বাদে ওয়ার্কিং উইমেনদের একটা হোস্টেলে সে চলে গেছে। বিভাবতীরা বাধা দেননি। যাবার সময় ভারী গলায় শুধু বলেছেন, 'হোস্টেলে কোনও অসুবিধে হলে সোজা এখানে চলে এস। এ-বাড়ির দরজা সব সময় তোমার জন্যে খোলা থাকবে।'

দু'চোখ বাষ্পে ভরে গিয়েছিল পারমিতার। কিছু একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল। পারে নি। বিচিত্র এক আবেগে গলার কাছটা ডেলা পাকিয়ে গিয়েছিল যেন। বিভাবতী আর নিরুপমকে প্রণাম করে যখন সে উঠে দাঁড়িয়েছিল তার ঠোঁটদু'টো থরথর করে কাঁপছে।

পারমিতার কথা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ কী ভাবলেন মনোবীণা। তারপর সামনের ফাইল থেকে তার দরখাস্তটা বার করে তার ওপরে এক জায়গায় আঙুল রেখে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি লিখেছ এখন 'গোল্ডেন পিকক' নামে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ কর। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ব্যাপারটা তা হলে কী।'

পারমিতার চোখেমুখে চকিতে কীসের যেন ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। সেটা লক্ষ করেছেন মনোবীণা কিন্তু এ-নিয়ে কোনও প্রশ্ন করলেন না।

উত্তরটা দিতে একটু সময় লাগল পারমিতার। তারপর যখন সে কথা বলল, গলার স্বরটা অনেকখানি চাপা শোনাল।—'ট্রান্সপোর্টের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। ট্র্যাভেল এজেন্সিতে সুযোগ-সুবিধা বেশি, স্যালারিও আগেরটার থেকে ভালো। তাই—'

'তোমার ডিউটি আওয়ার্স ক'টা থেকে ক'টা?

'সাড়ে ন'টা থেকে ছ'টা।

'ওভারটাইম, মানে ছ'টার পরও কি থাকতে হয়?'

'না। তবে ইয়ার এন্ডিংয়ের সময় চার-পাঁচদিন আটটা-সাড়ে আটটা অব্দি না থেকে উপায় নেই। তখন কাজের প্রেশারটা খুব বেশি থাকে।'

'তোমাকে কী ধরনের কাজ করতে হয়?'

'কাস্টোমার সারভিসের দিকটা দেখি। তাদের ট্রেন বা প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করতে হয়। যে-যে শহরে তারা যাবে সেই সব জায়গায় হোটেল রুম 'বুক' করি। এখন প্রচুর ট্র্যাভেল এজেন্সি অফিস খুলেছে। ভীষণ কম্পিটিশন। তাই অফিস আওয়ার্সের মধ্যেই মাঝে মাঝে ক্লায়েন্টদের অফিসে বা বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে হয়।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মনোবীণা জিগ্যেস করলেন, 'এবার তোমার ছেলের কথা বল। তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাওনি? আফটার অল নিজের সন্তান তো।'

ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ভেতরের আবেগকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগল পারমিতার। একসময় ভারী গলায় বলল, 'অনেকবার দেখা করতে গেছি। দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। লোকটা বিহারি, হাতজোড় করে বলেছে, হুকুম নেই। আমার শাশুড়ি চান না ছেলের সঙ্গে আমার কোনওরকম সম্পর্ক থাক।'

মনোবীণা নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

পারমিতা থামেনি, 'ও-বাড়িতে ঢোকা সম্ভব হয়নি। তবে অন্যভাবে চেষ্টা করেছিলাম। ছেলেটার জন্যে ভীষণ কষ্ট হত। কিছুই ভালো লাগত না, রাত্তিরে ঘুমোতে পারতাম না।' একটু চুপ করে থেকে ফের শুরু করল সে, 'সোনাকে একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। আমি সেখানে গিয়ে দেখা করতাম। ছেলেটা কাঁদত, আমার সঙ্গে চলে আসতে চাইত। কিন্তু আমাদের হোস্টেলে কোথায় নিয়ে তাকে রাখব? আমি তো অফিসে থাকি, তখন কে তাকে দেখবে? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আমি যদি ছেলেটাকে নিজের কাছে নিয়ে আসি ওরা আমার এগেনস্টে কিডন্যাপিং-এর চার্জ আনবে। ওদের বিরুদ্ধে কেস লড়ার মতো মনের জোর বা টাকা আমার নেই।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন মনোবীণা।—'তা ঠিক।'

একটু চুপ করে থেকে পারমিতা ব,লল, 'আমি যে আমার ছেলে সোনার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করি আমার শাশুড়ি তা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। কে. জি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে তিনি সোনাকে কার্শিয়াংয়ে একটা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।'

'তার মানে তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরে সোনাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কার্শিয়াংয়ে যাওনি?'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু—'

'কী?'

'আমাদের অফিসে বেশি দিনের ছুটি পাওয়া মুশকিল। তবু অনেক ধরাধরি করে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে একবারই মাত্র যেতে পেরেছিলাম। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাচ্চার ঠাকুমা ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না। বাচ্চার গার্জেন তার ঠাকুমা। তাঁর সেরকমই নির্দেশ। প্রিন্সিপ্যালকে বলেছিলাম, আমি সোনার মা। প্রিন্সিপ্যাল বলেছেন তিনি দুঃখিত। এ-ব্যাপারে নির্দেশ পালন করা ছাড়া তাঁর কোনও উপায় নেই। এ-জীবনে সোনার সঙ্গে আর বোধহয় আমার দেখা হবে না।'

'কিন্তু—'

মুখ তুলে মনোবীণার দিকে তাকায় পারমিতা। কোনও প্রশ্ন করে না।

'তুমি তো তোমার শাশুড়িকে বলে এসেছিলে যেভাবে হোক, ছেলেকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে। তার কী হবে?'

এবার ভেঙে পড়ে পারমিতা। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে ওঠে তার পিঠ। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায়

ফোঁটায় জল ঝরতে থাকে। ভাঙা ভাঙা, জড়ানো গলায় বলে, 'আর বোধহয় তা সম্ভব নয়। আমার কাছ থেকে ছেলেটাকে ওরা ছিনিয়েই নিল।'

ছেলের জন্য মায়ের এই কষ্টটা মনোবীণার বুকের ভেতর কোথায় যেন তুমুল নাড়া দিয়ে যায়। গভীর গলায় তিনি বলেন, 'কেঁদো না, কেঁদো না। দেখো, একদিন তোমার ছেলেকে ফিরে পাবেই। সোনাকে যেভাবে তোমার শাশুড়ি তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে তা পুরোপুরি বে-আইনি। অন্যায়।'

এসব সান্ত্বনার কথা। পারমিতার চোখের সামনে কোথাও এতটুকু আশার সংকেত নেই। অপার নৈরাশ্য আর ক্লেশে সেই কবে থেকে তার মন ভরে আছে। ছেলেকে ফিরে পাওয়া কত যে দুরূহ, তার নিজের চেয়ে কে আর তা ভালো জানে। সে উত্তর দিল না। কেঁদেই চলল।

মনোবীণা অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেশ খানিকটা পর শান্ত হল পারমিতা। মুখ থেকে হাত সরিয়ে ধীরে ধীরে চোখের জল মুছে বসে রইল। আজই প্রথম মনোবীণার সঙ্গে দেখা হয়েছে। অপরিচিত একজন বয়স্ক মহিলার সামনে এভাবে ভেঙে পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করল সে।

মনোবীণা লক্ষ করলেন, পারমিতার চোখ দু'টো ফোলা ফোলা, লাল। মুখমণ্ডল থমথমে। এবার একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন তিনি। পারমিতার দুঃখের জন্য তাঁর সহানুভূতি নিশ্চয়ই হচ্ছে কিন্তু শুধু আবেগে ভেসে গেলে চলে না। যে-কারণে চিঠি লিখে তাকে ডেকে আনা সে-সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। জিগ্যেস করলেন, 'ওয়ার্কিং উইমেনস হোস্টেল থেকে তুমি চলে আসতে চাইছ কেন?'

পারমিতা বলল, 'অন্য হোস্টেলের কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমি যেখানে থাকি সেখানকার পরিবেশ ভালো নয়। অনেক মেয়েই ড্রিংক করে, সিগারেট খায়, তাদের অনেক পুরুষ বন্ধু। বিশেষ করে আমার অন্য যে-দুই রুমমেট রয়েছে তাদের মতো বাজে মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি। আপনি আমার মায়ের মতো। সব বলা যায় না। তবু কিছু কিছু না বললে বোঝানো যাবে না। দু'জনেই রাত বারোটা-একটার আগে হোস্টেলে ফেরে

না। এক-এক দিন এক-একটা ছেলে তাদের পৌঁছে দিয়ে যায়। পুরো মাতাল। একদিন যে-মেয়েটার নাম রণিতা, তাকে নিয়ে দু'টো ছেলে মাঝরাতে প্রচণ্ড মারপিট বাধিয়ে দিয়েছিল। একজন আরেকজনকে ছুরিও মেরে বসেছে। এইরকম একটা অবস্থায় আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, বেশিদিন থাকলে আমি নির্ঘাত মরে যাব।' একটু ভেবে বলল, 'নইলে কোনওদিন আমার চরম ক্ষতি হয়ে যাবে।'

মনোবীণা বললেন, 'ওই হোস্টেলটা ছেড়ে অন্য কোনও হোস্টেলেও তো চলে যেতে পারতে।'

পারমিতা বলল, 'সাহস হয়নি।'

'কেন?'

'সেখানকার পরিবেশ আরও খারাপ হবে কিনা, এই ভয়ে যেতে পারিনি। কী করব, কোথায় যাব, ওই নোংরা পরিবেশ থেকে কীভাবে মুক্তি পাব, ভেবে ভেবে যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছি সেইসময় কাগজে আপনার এই বিজ্ঞাপনটা দেখলাম। মনে হল আপনার কাছে থাকার সুযোগ পেলে বেঁচে যাব।'

'আমি যে মানুষ ভালো, বুঝলে কী করে? আগে তো কখনও আমাকে দেখনি।'

'তা দেখিনি। তবে আমার বিশ্বাস কলেজের যিনি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তিনি কখনও খারাপ মানুষ হতে পারেন না। তিনি মায়ের মতোই হবেন।'

মেয়েটা কি এ-বাড়িতে ঢোকার জন্য তোষামুদি করছে—নিছক ফ্ল্যাটারি? খুঁটিয়ে পারমিতাকে লক্ষ করলেন মনোবীণা। সরল, নিষ্পাপ মুখ। নিজের সম্বন্ধে বেশ একটু গর্বই আছে তাঁর। বেয়াল্লিশ বছর কলেজে পড়িয়েছেন। হাজার হাজার ছাত্রী তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে। মুখ দেখলে তিনি অন্তত মেয়েদের চিনতে পারেন। তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া এত সহজ নয়।

কিছুক্ষণ কী ভাবেন মনোবীণা। তারপর জিগ্যেস করেন, 'তোমার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই তো? ধর, তোমাকে এখানে থাকতে দিলাম। মাঝে মাঝে তাকে এনে তুললে। আমি কিন্তু এসব ঝঞ্ঝাট পছন্দ করব না। তক্ষুনি তোমাকে

তোমার জিনিসপত্র সুদ্ধ বার করে দেব।'

'বয়ফ্রেন্ড।' প্রায় শিউরে উঠল পারমিতা।—'আমার বয়েস বেশি নয় কিন্তু তার মধ্যেই যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে কোনও পুরুষকেই, বিশেষ করে তারা যদি ইয়াং ম্যান হয়—একেবারেই বিশ্বাস করি না। আমার জীবনের এই চ্যাপ্টারটা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে।'

'তোমাদের যারা কাস্টোমার তাদের মধ্যে ইয়াং ম্যান নেই?'

মনোবীণার ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিল পারমিতা। ঘি আর আগুনের সেকেলে উপমা বা এই দু'টো বস্তুর সম্পর্ক হয়তো মাথায় ঘুরছে তাঁর। তরুণ কাস্টোমারদের কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠতা হওয়া তো অসম্ভব কিছু নয়। পারমিতা জোর দিয়ে পুরুষ-বন্ধু না থাকার কথা বললেও তিনি আরেকটু বাজিয়ে নিতে চাইছেন।

পারমিতা বলল, 'যারা আমাদের কাস্টোমার—ইয়াংই হোক বা ওল্ডই হোক—টাকা দেয়, আমরা তাদের কাজ করে দিই, সম্পর্ক সেখানেই শেষ। সম্পূর্ণ প্রফেশনাল ব্যাপার। তার বাইরে অন্য কিছু আমরা ভাবতে পারি না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মনোবীণা বললেন, 'তোমার অফিসের আর হোস্টেলের ঠিকানা অ্যাপ্লিকেশনে লিখেছ। তোমাদের বাপের বাড়ি মানে যেখানে মা-বাবার কাছে থাকতে আর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়ে যাও।'

তার বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা দিয়ে মনোবীণা কী করবেন ভেবে পেল না পারমিতা। মনোবীণা একটুকরো কাগজ আর পেন এগিয়ে দিয়েছিলেন। কোনও প্রশ্ন না করে লিখে ফেলল পারমিতা।

মনোবীণা কাগজটা তাঁর ফাইলে রেখে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, একটা কথা জিগ্যেস করছি। তুমি কত স্যালারি পাও?'

'ন' হাজার দুশো টাকা। তবে কেটেকুটে সাত হাজার ন'শো হাতে পাই।'

'হোস্টেলে কত দিতে হয়?'

'সাড়ে চার হাজার।'

'শুধু থাকার জন্যে?'

'না। সকালের ব্রেকফাস্ট আর রাতের খাবারটা ওরা দেয়। দুপুরে বাইরে খেতে হয়। অবশ্য ছুটির দিনে লাঞ্চটাও এই সাড়ে চার হাজারের মধ্যে পাওয়া যায়।'

'দুপুরের লাঞ্চ, বিকেলের টিফিন, বাসভাড়া, অসুখবিসুখ, লন্ড্রির বিল—এসব মিটিয়ে তোমার সেভিংস বলতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা ছাড়া আর তো কিছুই থাকে না।'

পারমিতা চুপ করে রইল।

মনোবীণা বললেন, 'ঠিক আছে, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। তুমি এখন এস।'

সোফার এক কোণে তার বড় ব্যাগটা রেখে বসেছিল পারমিতা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সেটা তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। ভয়ে ভয়ে, দ্বিধার সুরে বলল, 'আমি খুব আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম।'

সে কী জানতে চায় অনুমান করে নিলেন মনোবীণা। বললেন, 'আমার সিদ্ধান্ত এক সপ্তাহের ভেতর চিঠি দিয়ে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

পারমিতা আর দাঁড়াল না, বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার মুখচোখ দেখে মনোবীণার মনে হল, একটু যেন হতাশই হয়েছে মেয়েটা। পারমিতা হয়তো ভেবেছে, আজই যা জানাবার জানিয়ে দেবেন তিনি এবং সেটা ওর পক্ষেই যাবে।

পারমিতা চার নম্বর প্রার্থী। এখনও একজন ক্যান্ডিডেট বাকি। তাকেও ডাকা হয়েছে, সে আসবে কাল। সেই মেয়েটিকেও একবার দেখে নেওয়া দরকার। এটা ঠিকই, পারমিতাকে তাঁর ভালোই লেগেছে। তবু হুট করে একটা অচেনা, অনাত্মীয় মেয়েকে ফ্ল্যাটে এনে তুলবেন—সে পারমিতা বা অন্য যে-কেউ হোক না—সেটা তো আর হয় না। তাকে সব দিক থেকে বাজিয়ে দেখে নেওয়া দরকার।

দুই

লিফটে করে নীচে নেমে বাইরের রাস্তায় চলে এল পারমিতা। 'নিউ আইল্যান্ড'-এর ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন এলাকা ছাড়িয়ে বাসরাস্তার দিকে যেতে যেতে ভয়ে ভয়ে বারবার এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল সে। ভাবছিল সেই লোকটা কি টের পেয়েছে পারমিতা 'নিউ আইল্যান্ড'-এর 'মৈনাক' বিল্ডিংয়ে এসেছিল। সে কি শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে তার পিছু পিছু এতদূর অবধি পৌঁছে গেছে?

চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পারমিতা। ভালো করে লক্ষ করা দরকার, লোকটা কোথাও ওত পেতে আছে কিনা। সে মনোবীণা লাহিড়ীকে জানিয়েছে, উইমেনস হোস্টেলের নোংরা কদর্য পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা ভদ্র, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করছে। সবটা ঠিক বলেনি পারমিতা। যা বলেছে তা অর্ধসত্য। হোস্টেলের আবহাওয়া সত্যিই খারাপ, আবিলতায় ভরা; সেখানে যে-কোনও শিষ্ট, সভ্য মেয়ের পক্ষে দিনের পর দিন কাটানো অসম্ভব। ওখানে ঢুকলেই মনে হয় গা গুলিয়ে আসছে। এসব তো আছেই। কিন্তু একটা মারাত্মক ব্যাপার সে মনোবীণাকে জানায়নি। জানালে সেই মুহূর্তে তিনি তাকে বিদায় করে দিতেন। মেয়েদের ওই হোস্টেলটা ছাড়ার বড় একটা কারণ সুরজিৎ। লোকটা তার পেছনে রাহুর মতো লেগে আছে। মাঝখানে বছর দুই সুরজিৎ কলকাতায় ছিল না। সহজভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারছিল পারমিতা। মনে হচ্ছিল, বুকের ভেতর যে আতঙ্কটা পাথরের চাঁইয়ের মতো আটকে ছিল সেটা সরে গেছে। আঃ কী

যে আরাম, কী যে অফুরান স্বস্তি! কিন্তু দিন পনেরো আগে সেই লোকটাকে আচমকাই দেশপ্রিয় পার্কের কাছে দেখে ফেলেছিল পারমিতা। পুরো নাম সুরজিৎ রাহা। বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ। প্রায় ছ'ফিটের কাছাকাছি হাইট, লম্বাটে মুখ, শক্ত চোয়াল, চোখের মণি বাদামি, পাথরের পাটার মতো চওড়া বুক, ছড়ানো কাঁধ, পুরু ঠোঁট। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে মজবুত স্বাস্থ্য। শরীরে থলথলে চর্বি নেই, সবটাই পেশি। লোকটার মধ্যে একটা জান্তব ব্যাপার আছে। লোকটা যে কলকাতায় ফিরে এসেছে তা কে জানত।

সুরজিতের নানা ধরনের বিজনেস, অঢেল টাকা, পাঁচ-ছ'টা গাড়ি। নিরুপম যে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে পারমিতার প্রথম চাকরিটা করে দিয়েছিলেন সেখানে প্রায়ই আসত সুরজিৎ। সে ওই কোম্পানির একজন দামি কাস্টোমার। দেশের নানা শহরে—দিল্লি, লুধিয়ানা থেকে সুরাট আমেদাবাদ, ওদিকে চেন্নাই বাঙ্গালোর—ট্রাক বোঝাই করে মাল পাঠাত। সেই কারণে মাঝে মাঝেই পারমিতাদের অফিসে আসত। যাতায়াতের ফলে তার নজর এসে পড়েছিল পারমিতার ওপর। সে সুন্দরী, একটা বাচ্চা হয়ে গেলেও তার চেহারায় তীব্র একটা আকর্ষণ রয়েছে। সুরজিৎ ট্রান্সপোর্ট অফিসে এলেই তার ছোট চেম্বারে গিয়ে দেখা করত। কথাবার্তায় চমৎকার। কত রকমের জোক যে সে জানে।

প্রথম দিকে ভালোই লাগত পারমিতার। মনে আছে আলাপ হওয়ার মাসখানেক বাদে হঠাৎ সুরজিৎ বলেছিল, 'আজ সন্ধেয় কী করছেন মিস দত্ত?'

সমরেশের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর পৈতৃক পদবিটাই ফের নামের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিল পারমিতা। বিয়ে করে সে হয়েছিল বসু, এখন আবার দত্ত। একটু অবাক হয়েই সে জিগ্যেস করেছিল, 'কেন বলুন তো?'

'অফিসে আপনি এত ব্যস্ত থাকেন যে ভালো করে কথাই বলা যায় না। চলুন না কোথাও বসে কফি খেতে খেতে একটু গল্প করা যাবে।'

অস্বস্তি এবং এক ধরনের ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে গিয়েছিল পারমিতার। কিন্তু চোখেমুখে তা ফুটে বেরুতে দেয়নি। রূঢ়ভাবে যে 'না' বলে দেবে তাও পারে নি। সুরজিৎ তাদের একজন বড় কাস্টোমার। তাকে ওভাবে

বলা যায় না। সে অল্প হেসে বলেছে, 'আমার মতো একজন সাধারণ মেয়ের সঙ্গে গল্প করে সময় নষ্ট করবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।'

সুরজিৎ তার চোখে চোখ রেখে বলেছে, 'নিজের সম্বন্ধে আপনার এত বিনয় কেন? কেন নিজেকে এত ছোট ভাবছেন? আপনার মধ্যে কী আছে তা আমি জানি! তা হলে ওই কথাই রইল। আজ সন্ধেয় আমরা একসঙ্গে বসে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় কফি খাব।'

তার সম্বন্ধে সুরজিতের আগ্রহটা যে একটু বেশিই এবং সেটা ক্রমশ দৃষ্টিকটু ধরনের হয়ে উঠছিল তা টের পেয়েছিল পারমিতা। ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক প্রভুদাস জয়সোয়াল। প্রভুদাস বয়স্ক, ভালোমানুষ, হৃদয়বান। খুবই ধর্মপ্রাণ। তাঁর মধ্যে কোনও রকম নীচতা বা নোংরামি নেই। পারমিতাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন এবং এখনও করেন। সুরজিৎ সম্পর্কে আগেই প্রভুদাস তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। লোকটা লুচ্চা, বদমাশ। পারমিতা যেন কোনওভাবেই তার খপ্পরে না পড়ে। এদিকে সুরজিৎ বড় একজন ক্লায়েন্টও। তাই পারমিতা এমন কিছু যেন না করে বসে যাতে সুরজিৎ এই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ছেড়ে অন্য কোনও কোম্পানিতে চলে যায়। নিজেকে এবং কোম্পানির স্বার্থ বাঁচিয়ে কৌশলে সুরজিৎকে এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রভুদাসজি।

সুরজিতের কফি খেতে খেতে গল্প করার ব্যাপারটা যে একটা ফাঁদ তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি পারমিতার। সে বলেছে, 'ক্ষমা করবেন, সন্ধেবেলা আমার অন্য জায়গায় একটা কাজ রয়েছে।'

হেসে হেসে সুরজিৎ বলেছে, 'আপনার কোনও কাজ নেই। আমি জানি, অফিসের পর হোস্টেল ছাড়া আপনি আর কোথাও যান না। এনিওয়ে আজ তা হলে কফি খাওয়া থাক। নেক্সট উইকে একদিন ওটা হবে। আমি আগে থেকেই ডেটটা জানিয়ে দেব।'

পরের সপ্তাহেও শরীর খারাপের অজুহাতে কফি খাওয়া, গল্প করার নেমন্তন্নটা নাকচ করে দিল পারমিতা।

কিন্তু সুরজিৎ নাছোড়বান্দা, একেবারে জোঁকের মতো লেগে ছিল। সে বলেছে, 'বুঝতে পারছি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছেন কিন্তু পারবেন না।'

উৎকণ্ঠায় স্নায়ুমণ্ডলী ছিঁড়ে যাচ্ছিল পারমিতার। বলেছিল, 'কেন আমাকে অতিষ্ঠ করছেন?'

'অতিষ্ঠ কী বলছেন! আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। জানেন, আমি খুব দুঃখী মানুষ। ভীষণ কষ্ট। স্ত্রী থেকেও নেই। বাপের বাড়িতেই পড়ে থাকে। মাসের শুরুতে এসে গোছা গোছা টাকা নিয়ে যায়। আমি একেবারে একা, ভীষণ লোনলি।' বলতে বলতে গলার স্বর ভারী হয়ে গিয়েছিল সুরজিতের।

পারমিতা উত্তর দেয়নি। দুঃখী মানুষের কাঁদুনি গাওয়াটা সুরজিতের যে নতুন ধরনের একটা চতুর কৌশল তা কি আর বোঝেনি পারমিতা?

সুরজিৎ ফের বলেছে, 'মাঝে মাঝে আপনার কোম্পানি পেলে মনে হবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা মানে আছে। আপনার করুণা কি পাব না?'

প্রভুদাসকে সুরজিতের এই সব ধূর্ত চালের কথা বার বার জানিয়েছে পারমিতা। কিন্তু শাঁসালো ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে তিনি একই পরামর্শ দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ পারমিতা নিজেকেই রক্ষা করুক ; মেয়েটার প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে কিন্তু সুরজিৎকে ঠেকানোর জন্য একটি আঙুলও তিনি তুলবেন না। হাজার হোক, তিনি ব্যবসাদার মানুষ। নিজের স্বার্থ তাঁর কাছে সব চেয়ে বড়। সেটা বাঁচিয়ে যেটুকু পরোপকার করা যায় তার বেশি প্রভুদাস আর কিছুই করবেন না।

মাসকয়েক পেছনে ঘোরাঘুরি করার পর যখন পারমিতাকে হাতের মুঠোয় পোরা গেল না তখন সুরজিতের ভেতর থেকে অন্য একটা চেহারা বেরিয়ে এসেছিল। প্রথমে দুঃখী মানুষের ভান করেছে সে, এবার গলা চড়িয়ে বলেছে, 'তুমি কত টাকা মাইনে পাও আমি জানি। এই চাকরি ছেড়ে দাও। তোমার নামে কয়েক লাখ ফিক্সড ডিপোজিট করে দিচ্ছি। পশ লোকালিটিতে একটা থ্রি-বেডরুম ফ্ল্যাটে তুমি থাকবে। প্রতি বছর ইউরোপ-আমেরিকায় তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব।'

এবার আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে শক্ত করে তুলেছে পারমিতা। সে বুঝেছে, ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে চলবে না। যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত রেখে রুখে দাঁড়াতে হবে। পারমিতা বলেছে, 'আপনার কোটি কোটি টাকা থাক, আমার

তাতে কিছু যায় আসে না। দয়া করে লোভ দেখাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি খুব সম্ভব জীবনে এক ধরনের মেয়েই দেখেছেন। আমি তাদের মধ্যে পড়ি না। অফিসিয়াল ব্যাপার ছাড়া আমার সঙ্গে এর পর অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলবেন না।'

কিন্তু তার কথা কানে তোলেনি সুরজিৎ। পারমিতার অফিসে আসাটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল লোকটার। আগে সপ্তাহে দু-একদিন আসত, পরে চার-পাঁচ দিন। বেশিক্ষণ অবশ্য থাকত না। যতটুকু সময় থাকত, একই কথা বলে যেত।

যখন কোনওভাবেই পারমিতাকে হাতের মুঠোয় আনা যাচ্ছে না তখন সুরজিৎ খেপে উঠেছিল।

ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে ডিউটি আওয়ার্স ছিল সাড়ে ন'টা থেকে ছ'টা। কিন্তু সেখানে কাজের চাপ এত বেশি যে আটটা সাড়ে-আটটার আগে কখনও বেরুনো যেত না। কোনও কোনও দিন ন'টাও বেজে যেত। ওভারটাইম কাজ করার জন্য মাইনে ছাড়াও আলাদা করে বেশ ভালো টাকা দিতেন প্রভুদাস।

অফিস থেকে পারমিতাদের হোস্টেল বেশ খানিকটা দূরে। বাস বা মিনিবাসে যাতায়াত করতে হত। একদিন আটটা নাগাদ বেরিয়ে সে বাসে ফিরছে, জানালার ধারে সিট পেয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল সুরজিৎ তার গাড়ি নিয়ে পাশে পাশে চলেছে। অর্থাৎ সে বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি ওত পেতে ছিল, পারমিতা বাসে উঠতেই চিতার মতো তার পিছু নিয়েছে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, সে কোথায় থাকে সেটা জানতে চায় ; তারপর সেখানে হামলা চালাবে।

বুকের ভেতরটা কেঁপে গেছে পারমিতার। চট করে বাস থেকে নেমে গলিটলি দিয়ে অন্য একটা রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরে হোস্টেলে যখন পৌঁছল তখনও কাঁপুনিটা থামেনি।

অসীম অধ্যবসায় সুরজিতের। যখনই পারমিতা অফিস থেকে বেরুত, দেখতে পেত, রাস্তার উলটো দিকে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে। পারমিতা আর বাসে উঠত না, গলিঘুঁজি দিয়ে ঘুরপথে হোস্টেলে ফিরত। দিনের পর দিন এইভাবে সুরজিতের চোখে ধুলো দিয়েছে।

একদিন কিন্তু পারা গেল না। অফিস থেকে সেদিন বেরুতে বেরুতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। রোজই বেরুবার পর চারিদিক খুব ভালো করে দেখে নিত পারমিতা। কিন্তু না, কোথাও সুরজিৎ বা তার গাড়িটা চোখে পড়েনি। বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই সে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অত রাতে রাস্তায় লোকজন কমে গেছে। বাস-টাসও তেমন চোখে পড়ছিল না। পারমিতা ঠিক করেছিল, আরেকটু দেখে ট্যাক্সি ধরবে।

সে জানত না, খানিক দূরে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে অনেকগুলো ট্রাক পার্ক করা ছিল; সেগুলোর আড়ালে একটা মারুতি-ওমনিতে বসে নজর রাখছে সুরজিৎ। আচমকা গাড়ি নিয়ে পারমিতার কাছে চলে এসেছে সে। দরজা খুলে রাস্তায় নেমে খুব ঠান্ডা গলায় বলেছিল, 'চার-পাঁচ মাস ধরে আমাকে অনেক খেলিয়েছ। এই দেখছি অফিস থেকে বেরুলে, তারপরেই গলি-ফলি দিয়ে উধাও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলে কি? নাও—গাড়িতে ওঠ।'

প্রচণ্ড ত্রাসে মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল পারমিতার। হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন থমকে গেছে। গলা দিয়ে স্বর ফুটছিল না, শুধু জোরে জোরে মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ গাড়িতে উঠবে না।

মুখচোখ হিংস্র হয়ে উঠেছিল সুরজিতের। পারমিতার হাত ধরে টানতে শুরু করেছিল সে। পারমিতা প্রাণপণে শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সাধ্য কি পেরে ওঠে! সুরজিতের দুই থাবা তাকে সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরেছে।

বোধবুদ্ধি, চিন্তা করার শক্তি, সব যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছিল পারমিতার। তবে এটুকু বুঝতে পারছিল, কিছু একটা করতে হবে, করতেই হবে। নইলে তার মহা সর্বনাশ ঘটে যাবে।

হঠাৎই মাথায় বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল পারমিতার। যেভাবেই হোক নোংরা লম্পট শয়তানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেই হবে। উন্মত্তের মতো সে চিৎকার করে উঠেছিল, 'কে আছ বাঁচাও— বাঁচাও—'

খানিক দূরে যে-ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলোর ড্রাইভার আর খালাসিরা দৌড়ে এসেছে। এরা সবাই অবাঙালি। বেশির ভাগই শিখ। সবাই

চেনা। পারমিতাদের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সঙ্গে তাদের অনেকদিনের কারবার। ওরা জিগ্যেস করেছে, 'কিয়া হুয়া বহেনজি?'

ততক্ষণে পারমিতার হাত ছেড়ে দিয়েছিল সুরজিৎ। পারমিতা তাকে দেখিয়ে ট্রাক ড্রাইভারদের বলেছিল, 'এই বদমাশটা আমাকে টেনে ওর গাড়িতে তুলতে চাইছিল। আমাকে বাঁচান।'

শিখেরা সুরজিতের দিকে তেড়ে গিয়েছিল, 'শালে, কুত্তে কাঁহাকা—তেরা ঘরমে মা-বহেন নেহি হ্যায়—কিয়া?'

ওদের মারমুখি মূর্তি দেখে একেবারে কেঁচো হয়ে গিয়েছিল সুরজিৎ। দৌড়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে দিতে পারমিতাকে শাসিয়েছিল, 'আজ বেঁচে গেলে। কতদিন তোমাকে ড্রাইভার-খালাসিরা রক্ষা করে, দেখব।'

যেভাবে লুচ্চা জানোয়ারটা পেছনে লেগে আছে, কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে, বুঝতে পারছিল না পারমিতা। তার মনের জোরটা দ্রুত ধসে পড়ছিল। কিন্তু কিছু একটা না করলেই নয়। অনেক ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত প্রভুদাস জয়সোয়ালকে বলেছিল, 'চাচাজি, আমি সুরজিৎ রাহার নামে থানায় ডায়েরি করতে চাই। রাস্তায় বেরুলে আমার পিছু নিচ্ছে, জোর করে তার গাড়িতে টেনে তুলতে চাইছে। কোনদিন কী ঘটিয়ে ফেলবে, কে জানে।'

প্রভুদাস আঁতকে উঠেছেন।—'ডায়েরি করবে? তুমি আমার কোম্পানিতে কাজ কর। সুরজিৎ রাহা আমাদের একজন বড় ক্লায়েন্ট। তাকে চটানো কি ঠিক হবে?'

প্রভুদাসের মনোভাবটা আগেই জানত পারমিতা। সুরজিৎ ফি মাসে দেশের নানা প্রান্তে প্রচুর মাল পাঠায়। বিল দেওয়া মাত্র টাকা মিটিয়ে দেয়। এত বড় একজন ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে তাই তিনি নিজে থেকে কিছু করেননি। বা সুরজিৎকে বলেননি, 'আমার এমপ্লয়ীকে বিরক্ত করবেন না।' কিন্তু পারমিতা আত্মরক্ষার জন্য থানায় গিয়ে নালিশ জানাবে এটা মেনে নিতে পারেন নি। হয়তো প্রভুদাসের ধারণা এর ফলে সুরজিৎ তাদের কোম্পানির ওপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সেটা তিনি চান নি। এদিকে পারমিতার প্রতিও রয়েছে তাঁর অসীম সহানুভূতি। দু'দিকের টানাপোড়েনে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি।

পারমিতা ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করেছিল, 'কিছু যদি না করি, আমার প্রোটেকশনের কী হবে?'

এই প্রশ্নটাই হয়তো ভেতরে ভেতরে প্রভুদাসকে বিচলিত করে তুলেছিল। সাপও মরবে লাঠিও না ভাঙে, এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার। অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি বলেছেন, 'আমাকে তিন দিন সময় দাও। ভেবে দেখি কী করা যায়---'

ঠিক তিন দিন বাদেই প্রভুদাস বলেছিলেন, 'বেটি, তোমার জন্যে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে চাকরি ঠিক করেছি। মালিক একজন সিন্ধি, খুবই ভদ্রলোক। তিনি আমার বন্ধু। নাম মহেশ শিবদাসানি। তুমি আমার এখানে যে স্যালারি পাও, তিনি তার চেয়ে এক হাজার বেশি দেবেন।'

বেশ অবাকই হয়েছিল পারমিতা। জানতে চেয়েছে, এতে সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? সুরজিৎ যে সেখানে গিয়ে হাজির হবে না তার কি কিছু ঠিক আছে?

প্রভুদাস বলেছিলেন, 'কলকাতা মস্ত শহর। মহেশের অফিসটাও অনেক দূরে—সেই এলগিন রোডে। সুরজিৎ রাহা যদি জিগ্যেস করে তুমি কোথায়? আমি বলব, জানি না। আচানক কাউকে কিছু না বলে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

প্রভুদাসের কৌশলটা ধরতে পেরেছিল পারমিতা। অন্য কোম্পানিতে কাজ জুটিয়ে দিয়ে তিনি তাকে বাঁচাতে চেয়েছেন, সেই সঙ্গে সুরজিৎকেও চটাতে চাননি।

পারমিতা জিগ্যেস করেছিল, 'কিন্তু লোকটা যদি আমি যেখানে থাকি সেখানকার ঠিকানা জানতে চায়?'

'তোমার হোস্টেলের অ্যাড্রেস কখনই দেব না। বানিয়ে যা হোক একটা কিছু বলব। খোঁজাখুঁজি করে তোমাকে না পেয়ে যখন সে জিগ্যেস করবে, তাকে জানাব ওই ঠিকানাই তুমি আমাকে দিয়েছিলে।'

নতুন অফিসে যোগ দেবার পর ভয় এবং অস্বস্তি অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল পারমিতা। লম্পট, বদমাশটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। প্রভুদাসের সঙ্গে ফোনে তার যোগাযোগ ছিল। তিনি জানিয়েছেন, তার

কথা বার বার জিগ্যেস করেছে সুরজিৎ। প্রভুদাসের একই উত্তর। পারমিতা কোথায় আছে, কী করছে, তিনি কিছুই জানেন না।

মাস চারেক বাদে প্রভুদাস ফোন করে একটা সুখবর দিয়েছিলেন। সুরজিৎ ব্যবসার কাজে পুনেতে গেছে। আপাতত বেশ কিছুদিন সেখানেই থাকবে।

একই শহরে তারা থাকত। কলকাতা যতই বিশাল হোক আর যতই লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে থাকুক, কোনও না কোনও দিন সুরজিতের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেতে পারে। এই চিন্তাটা সূক্ষ্ম কাঁটার মতো তার মাথায় বিঁধে ছিল। সুরজিতের পুনেতে চলে যাবার খবরটা পেয়ে সে প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারছিল। হোস্টেলের পরিবেশটা জঘন্য হলেও অন্য দিক থেকে অস্বস্তি আর দুর্ভাবনার অবসান।

বছর দুই মোটামুটি স্বস্তিতে কেটে যাবার পর দিন পনেরো আগে হঠাৎ দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সুরজিৎকে দেখতে পেয়েছিল পারমিতা। সে ছিল ফুটপাথে, সুরজিৎ তার গাড়িতে। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছে পারমিতার। বজ্জাতটা তাকে লক্ষ করেছে কিনা, বুঝতে পারেনি সে।

এরপর একদিন তাদের হোস্টেলের কাছে সুরজিৎকে দেখা গিয়েছিল। সেদিনও সে ফুটপাথে আর সুরজিৎ গাড়িতে। লোকটা কি তার ঠিকানার হদিস পেয়ে গেছে? প্রবল উৎকণ্ঠায় সেদিনই প্রভুদাসকে ফোন করতে তিনি জানিয়েছিলেন, পুনে থেকে ফিরে এসেছে সুরজিৎ। এখন থেকে সে কলকাতায় থাকবে। পুনের ব্যবসার দায়িত্ব তার পার্টনারকে দিয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবে।

উদ্বেগ শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল পারমিতার। হোস্টেলের কাছাকাছি যখন সুরজিৎকে দেখা গেছে, সে একদিন না একদিন তার ঠিকানা কি আর জানতে পারবে না? তার মা-বাবা নেই, দাদা না থাকার মধ্যেই। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। তার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। প্রভুদাসজি ভালোমানুষ, কিন্তু ব্যবসা তাঁর কাছে অনেক বড় ব্যাপার। সুরজিতের মতো একজন ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করবেন না। ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য প্রভুদাস অন্য অফিসে চাকরি জুটিয়ে দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলেছেন। পৃথিবীতে পারমিতা একেবারে একা। এই শহরে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সুরজিতের মতো

হিংস্র এক চিতা গন্ধ শুঁকে শুঁকে তার হোস্টেলের ঠিকানা ঠিক বার করে ফেলবে। তখন?

হোস্টেলে থাকতে সাহস হচ্ছিল না পারমিতার। অন্য কোথাও তাকে চলে যেতে হবে, যেতেই হবে। কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে।

এই শহরে নির্বিঘ্নে থাকা যায়, এমন কোনও বাসস্থান কি আদৌ আছে? থাকলেও পারমিতার জানা নেই। বিভাবতীর কাছে চলে যাওয়া যেত কিন্তু বছরখানেক আগে তিনি মারা গেছেন। সে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রী। তবু একটা পলকা সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁর ভাইপো নিরুপমের কাছে কোনওভাবেই যাওয়া যায় না। যদিও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির চাকরিটা তিনি করে দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা তো বিভাবতীর কথায়। বিভাবতীই নেই, নিজের সমস্যা নিয়ে নিরুপমের কাছে যাওয়াটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

কী করবে, হোস্টেল পালটে কোথায় যাবে, এই সব ভেবে ভেবে পারমিতা যখন ভীষণ উতলা হয়ে উঠেছে সেই সময় মনোবীণা লাহিড়ির বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে গিয়েছিল তার। রিটায়ার্ড ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, বিশাল অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকেন, সেখানে নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র বন্দোবস্ত— পারমিতার মনে হয়েছিল, তিনি তাকে পছন্দ করলে তাঁর কাছে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। তাই চিঠি লিখে মনোবীণার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিছুক্ষণ আগে দেখা করার পর জেরায় জেরায় জিভ বার করে ছেড়েছেন কড়া ধাতের ভাইস প্রিন্সিপ্যালটি। অকপটে নিজের কথা সবই জানিয়েছে পারমিতা। শুধু সুরজিতের প্রসঙ্গটা বাদ।

মনোবীণা এক সপ্তাহ সময় নিয়েছেন। তারপর সিদ্ধান্ত জানাবেন। তাঁর ফ্ল্যাটে পারমিতার জায়গা হবে কিনা, জোর দিয়ে বলা যায় না। চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে গেল সে।

ধরা যাক, পারমিতাকে মনোবীণার পছন্দ হল। তিনি তাকে তাঁর ফ্ল্যাটে থাকতে দিলেন। তারপর যদি সুরজিৎ সেখানকার খোঁজ পেয়ে হাজির হয়ে যায়? না, এসব আর ভাবা যাচ্ছে না। যা হবার হবে। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিল সে।

মনোবীণাদের বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে বাস ধরেছিল পারমিতা। আজ ছুটির দিন। সোজাসুজি হোস্টেলেই ফিরবে সে। যেখানে তাকে নামতে হবে সেই স্টপেজটা তাদের হোস্টেল থেকে প্রায় পাঁচশো ফিট দূরে।

গাড়ি থেকে নেমে অন্যমনস্কর মতো হাঁটছিল পারমিতা। হোস্টেলের কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে, আচমকা চোখে পড়ল, সুরজিতের মারুতি-ওমনিটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে পার্ক করা আছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। নিশ্চয়ই বদমাশটা জানতে পেরেছে, পারমিতা এই হোস্টেলেই থাকে। ভয়ে তার সারা শরীর হিম হয়ে যায়।

এইটুকু বাঁচোয়া, মারুতি-ওমনিটার মুখ সামনের দিকে। স্টিয়ারিং হাতে সেদিকেই তাকিয়ে আছে সুরজিৎ। পারমিতা আসছিল পেছন থেকে, তাই সুরজিৎ তাকে দেখতে পায়নি।

সুরজিতের ওপর চোখ রেখে পিছোতে লাগল পারমিতা। না, এখন আর হোস্টেলে যাবে না। খানিকটা গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে এসে একটা ট্যাক্সি ধরে বলল, 'শ্যামবাজার চলুন—'

শ্যামবাজারে এসে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াল সে। তারই ফাঁকে একটা মোটামুটি ধরনের হোটেলে ভাত খেয়ে নিল। তারপর পথে পথে আবার হাঁটা। এইভাবে দিন প্রায় কাবার করে আগে আগে দিকে যখন সে হোস্টেলে ফিরল তখন কোথাও সুরজিতের গাড়িটা দেখা গেল না।

একটা দিন না হয় এড়ানো গেল? তারপর? এখন চিন্তাশক্তি কাজ করছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে শরীর ভেঙে আসছিল। নিজের কামরায় ঢুকে জুতো খুলে, কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল পারমিতা। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে এল।

তিন

পারমিতা এসেছিল সকালের দিকে। এখন বিকেল ফুরিয়ে আসছে। রিটায়ারমেন্টের পর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে গোটা তিনেক ট্যাবলেট খান। তারপর ঘণ্টাদুই ঘুমোন মনোবীণা। দিবানিদ্রাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এতে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগে।

দুপুরে ঘুমের পর চোখমুখ ধুয়ে পোশাক পালটে এখন ড্রইংরুমে বসে চা খাচ্ছেন মনোবীণা। হল-ঘরের অন্য দিকটায় ডাইনিং টেবিল, চেয়ার-টেয়ার বসানোর পরও বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। সেখানে বসে আরতি আনাজ কুটছে। এরপর ময়দা ঠাসবে। এ-বাড়িতে দু'বেলার রান্না দু'বেলাই করতে হয়। রোজ একরকম রান্না নয়। কোনও দিন রাত্তিরের জন্যে রুটি, লুচি বা পরটা। তবে রুটিটাই বেশি হয়। সেই সঙ্গে আলুর দম বা নানা সবজি দিয়ে একটা তরকারি বা পনিরের ডালনা। বেগুন ভাজা, ছোলার ডাল। রাতে চিকেনটা অবশ্য রোজই চাই মনোবীণার। আর দু-একটা মিষ্টি—কড়া পাকের সন্দেশ, গুলাবজামুন বা রাবড়ি। এই বয়সেও তাঁর ব্লাড সুগারে খুব বড় ধরনের গোলমাল নেই। তাঁর হাউস ফিজিশিয়ান ডাক্তার নীলাম্বর রায়চৌধুরি মিষ্টি খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। তবে পরিমাণ যেন কোনওভাবেই মাত্রাছাড়া না হয়। ব্লাড সুগার মোটামুটি নর্মাল থাকলেও হার্ট, কিডনি এবং প্রেশারের সমস্যা রয়েছে। সেজন্য সারা দিনে বেশ ক'টা ট্যাবলেট খেতে হয়।

আরতি রান্নার তোড়জোড় করছে। মাধব নেই। দুপুরে খেয়েদেয়ে সে বেরিয়ে গেছে। বাইরে তার আজ প্রচুর কাজ। সেগুলো মিটিয়ে কিছু কেনাকাটা সেরে ফিরতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যাবে।

চা খেতে খেতে ওবেলার কথা ভাবছিলেন মনোবীণা। যে-মেয়েটিকে অর্থাৎ পারমিতাকে তিনি চিঠি দিয়ে ডেকে এনেছিলেন তার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালোই লেগেছে। তাঁর ধারণা মেয়েটা বেশ সরল, তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই। নিজের সম্বন্ধে সে যা বলেছে তার সবটাই সত্যি বলে মনে হয়েছে। পারমিতাকে তিনি একরকম পছন্দই করেছেন। তবু খানিকটা দ্বিধাও রয়েছে।

আসলে মনোবীণার মনের একটা দিকে কোনওরকম জটিলতা নেই। সেখানে তিনি পৃথিবীর সবাইকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আরেকটা দিক খুবই সন্দেহপ্রবণ। তিনি স্থির করেছেন, মেয়েটাকে ফ্ল্যাটে ঢোকাবার আগে তার সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর নেওয়াটা ভীষণ জরুরি। তাই পারমিতা চলে যাবার পর তিনি অনুপমকে ফোন করেছিলেন।

অনুপম মিত্র লালবাজারের একজন তুখোড় অফিসার। বয়স একত্রিশ-বত্রিশ। সে মনোবীণার ছাত্রী সুরঞ্জনার স্বামী।

সুরঞ্জনা চমৎকার মেয়ে। ছাত্রী হিসেবে দুর্দান্ত। বি. এ'তে হিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। এম. এ'তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

কলেজ থেকে বেরিয়ে যাবার পর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে প্রাক্তন টিচারদের সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু সুরঞ্জনা মনোবীণার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল, এখনও রেখে যাচ্ছে। মনোবীণার কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সে যে বি. এ এবং এম. এ'তে সে এত ভালো রেজাল্ট করেছে তার পেছনে ছিলেন মনোবীণা। প্রিয় ছাত্রীটিকে দিনের পর দিন কাছে বসে পড়িয়ে, তার জন্য নোট তৈরি করে দিয়ে, কতভাবে যে সাহায্য করেছেন!

এম. এ'র পর ডক্টরেট করেছে সুরঞ্জনা, তখনও তার পাশে মনোবীণা। তারপর কলেজে চাকরি পেল। অনুপমের সঙ্গে বিয়ে হল।

অনুপম আই পি এস। খুবই আমুদে, হইহই করতে ভালোবাসে। একসময় মেধাবী ছাত্র ছিল। মনোবীণা তাকে বলেছেন, 'তোমার বাপু পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ঢোকা ঠিক হয়নি, কলেজে পড়ানো উচিত ছিল।'

অনুপম হেসে হেসে বলেছে, 'সবাই যদি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় চোর-ডাকাতদের টিট করবে কারা?'

প্রকাণ্ড অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকেন মনোবীণা। তাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও কখনও কখনও এসে অনুপম আর সুরঞ্জনা তাঁকে সঙ্গ দিয়ে যায়। যতটুকু সময় থাকে, অনুপম একেবারে মাতিয়ে রাখে।

সেই অনুপমকে তিনি আসতে বলেছেন। সন্ধের আগেই তার পৌঁছে যাবার কথা।

ঘড়িতে যখন ছ'টা বেজে এগারো, অনুপম এসে হাজির হল। পুলিশের ড্রেসে আসেনি; পরনে ট্রাউজার্স আর শার্ট।

অনুপম রীতিমতো সুপুরুষ। মনোবীণার মুখোমুখি একটা সোফায় বসতে বসতে সে হাসিমুখে জিগ্যেস করল, 'আমাকে এত জরুরি তলব কেন মাসিমা?'

কলেজে পড়ার সময় সুরঞ্জনা মনোবীণাকে ম্যাডাম বলত। পরে মাসিমা। তার দেখাদেখি অনুপমও মাসিমা বলে।

মনোবীণা বললেন, 'আগে চা খাও। তারপর সব বলছি।' আরতির দিকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলেন, সে আনাজ কাটা স্থগিত রেখে উঠে পড়েছে। আরতিকে কিছু বলতে হয় না। অনুপম বা সুরঞ্জনাকে দেখামাত্র আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওদের সঙ্গে মনোবীণার সম্পর্কটা কতখানি নিবিড়, তার জানা আছে।

একটু পর শুধু চা-ই নয়, সেই সঙ্গে কেক আর সন্দেশও দিয়ে গেল আরতি। মিষ্টি-টিষ্টি খাওয়া হলে চায়ে চুমুক দিয়ে অনুপম উৎসুক চোখে মনোবীণার দিকে তাকায়।—'এবার কী বলবেন বলুন—' আসলে মনোবীণা কখনও তাকে বা সুরঞ্জনাকে ডেকে পাঠান না। তারা নিজেরা এসেই বৃদ্ধার খোঁজখবর নিয়ে যায়। এই যে আজ ফোন করে ডেকে এনেছেন, সেটা গালগল্প করার জন্য নয়, নিশ্চয়ই মনোবীণার কোনও সমস্যা হয়েছে, যা আন্দাজ করতে পারছিল অনুপম। ভেতরে ভেতরে সে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

মনোবীণা বললেন, 'তোমার চা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।'

'না হোক, আপনি শুরু করুন।'

একটু চুপ করে রইলেন মনোবীণা। মনে মনে বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলেন, 'সুরঞ্জনা আর তুমি তো জানো, এই ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি। আরতি আর মাধব যতক্ষণ থাকে, মোটামুটি একরকম কেটে যায়। কিন্তু সন্ধেবেলা ওরা যখন চলে যায় তারপর থেকে কী ভীষণ নিঃসঙ্গ যে লাগে! টিভি অবশ্য আছে। নিউজ ছাড়া আর কিছু দেখি না। সিরিয়াল-টিরিয়ালগুলো অসহ্য। টিভি বন্ধ করে দিই। ট্রাঙ্কুইলাইজার খেলেও সহজে ঘুম আসতে চায় না। লোনলিনেস এই সময়টা যেন চারপাশ থেকে আমার ওপর চেপে বসে। আমার হার্টের অসুখ আছে। তাছাড়া আরও নানারকম ব্যাধি। হঠাৎ মাঝরাতে যদি স্ট্রোক-ট্রোক হয়ে যায়, ডাক্তারকে খবরও দিতে পারব না। হয়তো বিনা ট্রিটমেন্টে মরে পড়ে থাকব।'

এসব নতুন কিছু নয়; অনুপমের সবই জানা। সে উত্তর দিল না।

মনোবীণা বলতে লাগলেন, 'তাই একজন কম্পেনিয়ানের জন্যে দু-আড়াই উইক আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।'

অনুপম বলে, 'কই জানতাম না তো!'

'না, জানানো হয়নি। ভেবেছিলাম নিজেই সব ঠিক করে নিতে পারব। তারপর তোমাদের খবর দেব।'

বিজ্ঞাপন দেবার পর যা যা হয়েছে সব বিশদভাবে জানিয়ে পারমিতার কথাটা বললেন মনোবীণা।—'এই মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। অন্য যে ক'জনকে এখন পর্যন্ত ডেকেছি তাদের মধ্যে সমস্ত দিক থেকে সে ভালো। নম্র, ভদ্র, বিনয়ী।'

অনুপম বলল, 'তা হলে ওকেই আপনার কাছে নিয়ে আসুন।'

'সেটাই চাইছি। তবে—'

'তবে কী?'

'নিজের সম্বন্ধে সবই বলেছে পারমিতা। মনে হয় ঠিকই বলেছে; কোনওরকম কারচুপি করেনি। তবু আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাই। এ-ব্যাপারে একমাত্র তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পার।'

অনুপম বলল, 'বুঝতে পেরেছি। পছন্দ করলেও আপনার মনে কোথাও সংশয় রয়েছে।'

মনোবীণা মাথা নাড়েন।—'তা একটু আছে। মেয়েটা যা-যা বলেছে তার বাইরেও তো কিছু থাকতে পারে।'

'তা পারে।' অনুপম বলল, 'এ-বাড়িতে শেলটার পাওয়ার জন্যে কিছু গোপন যে করেনি, জোর দিয়ে বলা যায় না। ঠিক আছে, ওর ঠিকানা-টিকানা দিন, আমি কারেক্ট ইনফরমেশন নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেব।'

মনোবীণা একটা কাগজে পারমিতার হোস্টেল, তার অফিস, মা-বাবার সঙ্গে যেখানে থাকত সেই বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, তার দাদা-বৌদি—সবার নাম-ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন। সেটা অনুপমের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'কী?'

'ওর সম্বন্ধে যে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে, পারমিতা যেন জানতে না পারে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্লেন ড্রেসের ধুরন্ধর কিছু অফিসার আছে। তারা নিঃশব্দে সব ইনফরমেশন জোগাড় করে আনবে।'

'ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমার একটু তাড়াতাড়িই চাই।'

'ক'দিনের মধ্যে?'

'ধর তিন দিন। কেননা পারমিতাকে আমি বলেছি এক উইকের ভেতর আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব। মেয়েটা অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। তোমার কাছ থেকে খবর পাওয়ামাত্র ওকে চিঠি লিখে 'হ্যাঁ' বা 'না' জানিয়ে দেব।'

অনুপম বলল, 'তিন দিনের মধ্যেই সব পেয়ে যাবেন।'

এরপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তবে সেসব আলাদা বিষয়ে।

মনোবীণা জিগ্যেস করলেন, 'সুরঞ্জনা কেমন আছে?'

অনুপম বলল, 'ভালো। তবে এখন ভীষণ ব্যস্ত। কলেজে অ্যানুয়াল সোশাল হবে। তার নানারকম প্রোগ্রাম—গান-বাজনা, ড্রামা, ডিবেট, কুইজ—এমনি অনেক কিছু। তাই নিয়ে মেতে আছে। এ ছাড়া আরও একটা কাণ্ড করতে চলেছে।'

'কী কাণ্ড?'

'অ্যানুয়াল সোশালটা হয়ে গেলে বাড়িতে কোচিং ক্লাস বসাবে। প্রথমে দু'শিফট, পরে তিন শিফটে পড়াবে।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ। কলেজে আজকাল ভালো টাকা স্যালারি দেয়। বিরাট পে স্কেল। আমিও খারাপ পাই না। আরও টাকার কী দরকার, বুঝতে পারি না। এত খাটলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু একদম শুনছে না। আপনি একটু বকে দেবেন তো মাসিমা।'

'বকুনি তো দিতেই হবে। অনেকদিন সুরঞ্জনা আসেনি। ওকে পাঠিয়ে দিও।'

'নিশ্চয়ই পাঠাব।'

'আমাদের সানি সাহেবের খবর কী?'

সানি অনুপম আর সুরঞ্জনার আড়াই বছরের ছেলে। অনুপম বলল, 'দুষ্টুমিতে দিন দিন তার প্রতিভার বিকাশ হচ্ছে। ওকে এবার স্কুলে না দিলেই নয়। যেটুকু সময় আটকে থাকবে, বাড়ির লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কী পাজি যে হয়েছে!'

মনোবীণা হাসতে লাগলেন, 'ছেলেরা দুষ্টু না হলে ভালো লাগে? লাফাবে, ঝাঁপাবে, এটা করবে, সেটা করবে, হাতের কাছে যা পাবে ভাঙবে, চুরবে, সবাইকে নাচিয়ে বেড়াবে—তবেই না ছেলে। হাবাগোবা গোবরগণেশ মার্কা বাচ্চা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। সুরঞ্জনা যেদিন আসবে, সানিকে নিয়েই যেন আসে।'

অনুপম বলল, 'তা হলে আর দেখতে হবে না। আপনার এত সুন্দর ফ্ল্যাট লন্ডভন্ড করে দিয়ে যাবে।'

'দিক।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অনুপম জিগ্যেস করল, 'সুব্রতদা ফোন-টোন করে!' সুব্রত মনোবীণার একমাত্র সন্তান। সেই কবে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল। সেখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে ওদেশেই থেকে গেছে।

মনোবীণা বললেন, 'সাত মাস আগে লাস্ট ফোন করেছিল?' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'আমেরিকায় যাবার পর প্রথম দিকে রোজ রাত্তিরে ফোন করত। তারপর সপ্তাহে একদিন, সপ্তাহটা ক্রমশ মাসে গিয়ে দাঁড়াল। এখন পাঁচ মাস-ছ'মাস পর হঠাৎ একদিন হয়তো করল। ব্যাপারটা কী জানো?'

'কী?'

'আমাকে পুরোপুরি ভুলে যাবার প্রসেসটা শুরু করে দিয়েছে ছেলেটা। এরপর হয়তো আর কোনও দিনই ফোন কববে না।' বলতে বলতে চোখ দু'টো বাষ্পে ভরে যেতে থাকে মনোবীণার।

ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে অনুপম। সুরঞ্জনার সঙ্গে বিয়ের পর থেকে সময় পেলে এখানে আসে সে। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার ক্লেশটা যে কোথায় সেটা তার জানা আছে। সুব্রতর প্রসঙ্গটা না তুললেই বোধ হয় ভালো হত। আগে আগে অনেকবার সে আর সুরঞ্জনা মনোবীণাকে আমেরিকায় সুব্রতর কাছে চলে যাবার জন্য বুঝিয়েছে। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও যাবেন না তিনি। তাই একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাই এ-নিয়ে এখন আর কিছু বলে না অনুপমরা।

একটু আগে সানিকে নিয়ে লঘু সুরে কথা বলছিলেন মনোবীণারা। সুব্রতর প্রসঙ্গ উঠতেই ড্রইংরুমের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে।

একসময় অনুপম বলল, 'আজ তা হলে চলি মাসিমা?'

'এস।'

অনুপম তার কথা রেখেছে। তিন দিনের মধ্যেই পারমিতা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নিয়ে এসে হাজির হল সে। বলল, 'পারমিতা আপনাকে যা-যা বলে গেছে সব সত্যি। কোনও গোলমাল নেই। মেয়েটা রিয়ালি খুব দুঃখী।'

সত্যি হোক, এমনটাই খুব সম্ভব মনে মনে চেয়েছিলেন মনোবীণা। তাঁর চাওয়ার সঙ্গে অনুপমের অনুসন্ধানের ফল পুরোপুরি মিলে গেছে।

অনুপম এবার বলল, 'ওর হোস্টেলের পরিবেশটা একেবারেই ভালো নয়। কদর্য। একটা ব্যাপার লক্ষ করা গেছে, রোজ সকালে স্নান করেই পারমিতা

বেরিয়ে পড়ে। অফিসে যাবার আগে মহিলাদের জন্যে অন্য যেসব হোস্টেল রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে ঘোরে। অফিস ছুটির পরও তাই। হোস্টেল ছাড়াও এপাড়ায়-ওপাড়ায় কোথাও পেয়িং গেস্ট থাকা যায় কিনা, হন্যে হয়ে তার খোঁজ করে। এখন যেখানে থাকে সেই হোস্টেলটা ছাড়ার জন্যে মেয়েটা মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

মনোবীণা ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন।—'যে-পরিবেশে পারমিতা আছে সেখানে কোনও ভদ্র মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।' একটু ভেবে জিগ্যেস করলেন, 'পারমিতা সম্পর্কে আর কোনও ইনফরমেশন পাওয়া গেল?'

ইঙ্গিতটা ধরতে পারল অনুপম। বলল, 'আপনি কি ওর স্বভাব-চরিত্রের কথা জানতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেদিক থেকে কোনওরকম প্রবলেম নেই। এই ক'দিন পারমিতার পেছনে সকাল থেকে রাত অব্দি আমাদের লোকজন ছায়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। ওর কোনও প্রেমিক বা বয়ফ্রেন্ডের হদিস পাওয়া যায়নি। না, কোনও পুরুষের সঙ্গেই ওর সে-ধরনের সম্পর্ক নেই। পরিষ্কার, সচ্চরিত্র মেয়ে বলতে যা বোঝা যায় সে তাই।'

'ঠিক আছে। তোমাকে অনেক খাটালাম। আজই পারমিতাকে আমার ডিসিশন জানিয়ে চিঠি লিখব। সাত দিন সময় নিয়েছিলাম। তার মধ্যেই ও আমার উত্তর পেয়ে যাবে।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় অনুপমের। সে বলে, 'মাসিমা, একটা ব্যাপারে মুশকিলে পড়ে গেছি।'

'কী হয়েছে?' দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন মনোবীণা।

'সুরঞ্জনা আর আমি প্রায় সারাদিন যে যার কাজে বাইরে বাইরে থাকি। সানিকে যে মাসি দেখে তার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তার ওপর নানা ধরনের রোগ। সে আর পেরে উঠছে না। তার ছেলেরাও কাজ থেকে ছাড়িয়ে তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চাইছে। মাসি কাজ ছাড়লে আমরা বিপদে পড়ে যাব। অনেককে বলে রেখেছি, লোক জোগাড় করে দিতে। কিন্তু পছন্দমতো

কারওকে পাচ্ছি না। আপনি যদি নির্ঝঞ্ঝাট, ভালো কোনও মহিলার খবর পান, আমাকে বলবেন। মাইনের জন্যে চিন্তা নেই। সে যা চাইবে তা-ই দেব।'

মনোবীণা হাসলেন, 'আমি কি বাইরে বেরোই যে কাজের লোকের খোঁজ পাব? তবে মাধব আর আরতিকে বলব যদি ওরা ব্যবস্থা করে দিতে পারে।'

'আচ্ছা।' অনুপম আর বসল না। চলে গেল।

চার

যোগাযোগ করার জন্য অফিসের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দিয়েছিল পারমিতা। ছ'দিনের মাথায় মনোবীণার চিঠি পেয়ে গেল সে। তিনি তাকে ফোন করেননি।

খামের চিঠির একপাশে প্রেরকের নাম লেখা ছিল : মনোবীণা লাহিড়ি। নামটা দেখে বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে পারমিতার। কী লিখেছেন মনোবীণা? তাকে কি নাকচ করে দিয়েছেন?

কিছুক্ষণ নিঝুম বসে রইল সে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বার করে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলল। মনোবীণা লিখেছেন, চিঠি পাওয়ামাত্র সে যেন সুটকেস-টুটকেস গুছিয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে চলে আসে।

আহ্, কী অপার স্বস্তি! কী হালকা যে লাগছে নিজেকে! প্রায় দুশ্চিন্তামুক্ত। বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল তার।

ক'টা দিন উদ্ভ্রান্তের মতো সকালে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে বেশ রাত করে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে অফিসের সময়টুকু বাদে অন্য নিরাপদ বাসস্থান খোঁজা তো ছিলই কিন্তু আসল কারণটা সুরজিৎকে এড়ানো। শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে তার হোস্টেলের সন্ধান পেয়েছে, তবে অফিসের ঠিকানা অবশ্য জানতে পারেনি। লোকটা তার হোস্টেলের সামনে এসে সাড়ে আটটা থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। সেটা পারমিতার অফিসে বেরুবার সময়। আবার আসে সন্ধেবেলায়; সেটা তার ফেরার সময়।

মনোবীণা লাহিড়ির কাছে গিয়ে থাকলে সহজে সুরজিৎ তার সন্ধান পাবে না। তা ছাড়া অমন একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলার সহানুভূতি সে

পেয়েছে। এতদিন সে একা-একা দিন কাটিয়েছে, মাথার ওপর কেউ ছিল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সুরজিৎ সেখানে গিয়ে ঝঞ্ঝাট বাধাতে সাহস করবে না। পরক্ষণে উলটোটাও মনে হয়। সুরজিৎ গিয়ে হাজির হলে মনোবীণা ক্ষিপ্ত হয়েও উঠতে পারেন। তখন তাকে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে হয়তো বারও করে দেবেন।

কিন্তু না, এতসব আর এখন ভাবা যাচ্ছে না। যা হবার হবে, অন্যদিনের মতো আজও রাত করে হস্টেলে ফিরবে সে। রাত্তিরেই সেখানকার টাকাপয়সা মিটিয়ে কাল সকালে সূর্য ওঠার পর চলে যাবে মনোবীণার ফ্ল্যাটে। মালপত্র আর কতটুকু? যা আছে একটা বড় সুটকেস আর দু'টো ট্র্যাভেল ব্যাগের মতো ব্যাগে ভরে নেওয়া যাবে। সিঙ্গল-বেড খাট, ছোট ওয়ার্ডরোড, ড্রেসিং-টেবল আর যা-যা আছে, সব ভাড়া করা। মনোবীণার ফ্ল্যাটে উঠে যাবার পর ফোন করে যারা ভাড়া দিয়েছে তাদের অফিসে জানিয়ে দেবে। ওদের পাওনাগন্ডাও হিসেব করে কুরিয়ারে চেক পাঠিয়ে মিটিয়ে দেবে। ব্যস, জীবনের এক পর্ব শেষ।

পরদিন মনোবীণাদের হাই-রাইজ 'মৈনাক'-এ যখন পারমিতা পৌঁছল, তিনি তখন ড্রইংরুমে বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

কাল চিঠি পাওয়ার পরই মনোবীণাকে ফোন করে দিয়েছিল পাবমিতা। তিনি তার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই ফ্ল্যাটে আজই যে তাঁর একজন নতুন সঙ্গিনী আসছে সেটা মাধব এবং আরতিকে কালই জানিয়ে রেখেছিলেন।

কলিং বেল বাজতে মাধব গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিল। পারমিতা সুটকেস-টুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

মনোবীণা মাধবকে বললেন, 'পারমিতার জিনিসগুলো নিয়ে ওর ঘরে রেখে আয়।'

পারমিতা একটু কুণ্ঠাবোধ করছিল। তার মালপত্র খুবই সামান্য। সে নিজেই ভেতরে নিয়ে যেতে পারতো। মনোবীণার দিকে এক পলক তাকাল সে। নির্দেশ পালন না করা হলে প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপ্যালটি হয়তো রেগে

যাবেন। এর আগে মাত্র একবারই তাঁকে দেখেছে পারমিতা। তাঁর মেজাজ কখন কীরকম থাকে, সেদিনের ঘণ্টাখানেকের কথাবার্তায় বুঝে উঠতে পারেনি। কখনও ভীষণ কড়া মনে হয়েছে, কখনও খুবই সহৃদয়। সে তো সবে এখানে পা রাখল। মনোবীণাকে আপাতত বেশ কিছুদিন লক্ষ করে যেতে হবে। তাঁর তালে তাল মিলিয়ে চলা দরকার। তাঁর ধাত, তাঁর মেজাজ বুঝে গেলে আর সমস্যা থাকবে না।

পারমিতা নীরবে সুটকেস, ব্যাগট্যাগ মাধবের হাতে তুলে দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে এল। মাধব হল-ঘরের ওধারে পরপর যে তিনটে বেডরুম রয়েছে তার মাঝখানেরটায় গিয়ে ঢুকল।

মনোবীণা পারমিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'দরজাটা বন্ধ করে আমার কাছে এস।'

নিঃশব্দে তাই করল পারমিতা।

মনোবীণা তাকে সামনের সোফায় বসতে বলে আরতিকে তার জন্য চা আনতে বললেন।

চা খাওয়া হলে আরতি আর মাধবকে ডেকে এনে মনোবীণা তাদের বললেন, 'তোদের আগেই বলেছি এই দিদিমণি আজ থেকে আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওর যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখিস।'

দু'জনেই ঘাড় কাত করে জানায়—রাখবে। তারপর যে-যার কাজে চলে গেল।

মনোবীণা দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পারমিতাকে জিগ্যেস করলেন, 'এখন পৌনে ন'টা বাজে। সেদিন বলেছিলে তোমার অফিস সাড়ে ন'টায়। আজ কি অফিসে যেতে পারবে?'

পারমিতা বলল, 'বাড়ি শিফট করব বলে আজ আর কাল দু'দিন ছুটি নিয়েছি। পরশু থেকে অফিস করব।'

'গুড। এর মধ্যে তুমি কি বাইরে বেরুবে?'

'না। আপনাকে সেদিনই বলেছি, অফিস ছাড়া আমি আর কোথাও যাই না। অফিসের কলিগ ছাড়াও জানাশোনা দু'চারজন আছে। তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা

আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। কার কাছেই বা যাব?' বলে একটু থামল পারমিতা। তারপর ফের শুরু করল, 'আপনাকে তো নিজের কথা সবই জানিয়েছি। কিছুই গোপন করিনি। এই পৃথিবীতে আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

হল-ঘরের আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

একটু ভেবে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন মনোবীণা। প্রথম দিনই জেনে নিয়েছিলেন, হোস্টেলে থাকতে সেখানে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে যায় পারমিতা, লাঞ্চটা অফিসের কাছাকাছি কোনও সাদামাটা হোটেলের খাবার। রাতের ডিনার হোস্টেল। ছুটির দিনে, লাঞ্চ-ডিনার সবই হোস্টেলে। বললেন, 'হোস্টেলে যেমন খাওয়া-দাওয়া করতে, আমার এখানেও তাই করবে।'

একটু চুপ করে থেকে পারমিতা বলল, 'আচ্ছা—'

কিচেন থেকে আরতির গলা ভেসে এল।—'মা, নুচি-টুচি হয়ে গেচে। খাবার টেবিলে আসুন। লইলে সব জুইড়ে (জুড়িয়ে) যাবে।'

'চল—' পারমিতাকে সঙ্গে করে হল-ঘরের ও-প্রান্তে ডাইনিং টেবিলের কাছে চলে এলেন মনোবীণা। পাশের দেওয়াল ঘেঁষে একটা ঝকঝকে গোলাপি বেসিন। তার একধারে শ্বেত পাথরের র‍্যাকে সাদা ধবধবে তোয়ালে, লিকুইড সোপের সুদৃশ্য বোতল।

মনোবীণা বললেন, 'যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এস।'

ওরা খাবার টেবিলে বসতে না-বসতেই এসে গেল বড় প্লেটে গোলাকার লুচি, ছোট ছোট বাটি এবং প্লেটে বেগুন ভাজা, নানারকম সবজি দিয়ে একটা তরকারি, পনিরের ডালনা। এছাড়া রয়েছে কাটা ফল—আপেল, শসা, মুসম্বি, আনারস এবং বেশ ক'টা রসে টসটসে আঙুর। একটা গেলাসে বেলের শরবত।

এটা তো ঠিক, শ্বশুরবাড়িতে নানারকম লাঞ্ছনা এবং অসম্মান সহ্য করতে হয়েছে পারমিতাকে কিন্তু সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট ভালো। সকালে এরকমই লুচি-তরকারি, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি। দুপুরে সরু চালের ভাত, সুক্তো, ডাল, পনিরের ডালনা, বা অন্য কোনও সব্জি, দু'রকম মাছ, চাটনি,

দই। বিকেলে নোনতা হালুয়া বা চিঁড়ের পোলাও। রাত্তিরে রুটি বা পরটা, মাংস, আলুর দম এবং মিষ্টি।

মেয়েদের হোস্টেলে চলে যাবার পর ক'টা বছর খাওয়ার ভীষণ কষ্ট গেছে পারমিতার। হোস্টেল থেকে যা ব্রেকফাস্ট দেওয়া হত তা আর কহতব্য নয়। শুকনো দু'টুকরো টোস্ট, তার ওপর পাতলা করে যে মাখন লাগানো থাকত সেটা আদৌ মাখন কিনা কে জানে। ডিমের সঙ্গে ময়দা গুলে বিদঘুটে একটুকরো ওমলেট আর বিস্বাদ এক কাপ চা। দুপুরে অফিসের আশপাশের কোনও সস্তা হোটেল থেকে রুটি তরকারি আনিয়ে খেতে হত। এখনও সেটাই চলছে। হোস্টেলে ফিরে ডিনার। ডিনার আর কী! মোটা চালের ভাত, ডাল, নানা আনাজ দিয়ে ঘ্যাঁট আর দু-ইঞ্চি লম্বা ইঞ্চিখানেক চওড়া এক চিলতে মাছ। ব্যস।

খাবারের প্লেটগুলোর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিল পারমিতা। মনোবীণা বললেন, 'কী হল, হাত গুটিয়ে রেখেছ কেন? খাও—'

নিঃশব্দে খাওয়া শুরু হল।

একসময় মনোবীণা বললেন, 'একঘেয়ে রোজই লুচি-টুচি খেতে হবে না। মাঝে মাঝে মুখ বদলানোর জন্যে টোস্ট, ডিমের পোচ, কলা-টলাও খাই। আরতি নানারকম খাবার করতে জানে। সাউথ ইন্ডিয়ানটাই বেশি করে। ইডলি, দোসা, উপ্‌মা, সাদা বড়া, পোঙ্গল। কোনও কোনও দিন সেসবও দেয়। তোমার যা খেতে ইচ্ছে করে, আগে জানিয়ে দিও। আরতি করে দেবে।'

এমন যত্ন করে কাছে বসিয়ে মা ছাড়া আর কেউ কখনও পারমিতাকে খাওয়ায়নি। শ্বশুরবাড়িতেও দামি দামি সুখাদ্য সে খেয়েছে কিন্তু তার মধ্যে কতখানি গ্লানি যে মেশানো থাকত! কত যে চোখের জল! মনে হত এর চেয়ে বিষ খাওয়াও ভালো। আশ্চর্য এক আবেগ বুকের ভেতর থেকে উঠে এসে গলার কাছে কেমন যেন ডেলা পাকিয়ে যায়। ধরা ধরা, আবছা স্বরে পারমিতা বলে, 'আচ্ছা—' মনে মনে সে ঠিকই করে ফেলেছে, কোনও দিনই পছন্দমতো খাবারের কথা বলবে না। একটা নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল;

সেটা খুব সম্ভব পাওয়া গেছে। মনোবীণার আজকের ব্যবহারে সেরকমই মনে হচ্ছে। এর বেশি পারমিতা কিছু চায় না।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে মনোবীণা বললেন, 'চল, আমাদের ফ্ল্যাটটা তোমাকে ঘুরে ঘুরে দেখাই।'

হল-ঘরে ডাইনিং স্পেস, বসার জায়গা তো দেখাই আছে। মনোবীণা প্রথম তাকে নিয়ে গেলেন কিচেনে। রান্নাঘরে কত কিছুই না রয়েছে! গ্যাস-ওভেন, মাইক্রো-ওভেন, সুদৃশ্য সব ক্যাবিনেটে চাল ডাল মশলাপাতি ইত্যাদি। অন্যদিকে চমৎকার সব ক্রকারি। ধোঁয়া-টোয়া যাতে না লাগে সেজন্য চিমনিও লাগানো রয়েছে। এক কোণে ডাবল-ডোর বিরাট ফ্রিজ।

কিচেন থেকে দক্ষিণ দিকের একটা বেডরুমে পারমিতাকে নিয়ে গেলেন মনোবীণা। বিশাল ঘর। ফিটফাট, সাজানো-গোছানো। এয়ারকুলার লাগানো আছে এক দেওয়ালে। অন্য একটা দেওয়ালে নামকরা শিল্পীর দারুণ একখানা বাঁধানো পেন্টিং। আরেক দেওয়াল জুড়ে আগাগোড়া কাচে-ঢাকা র‍্যাকে অজস্র বই।

পুরো মেঝে জুড়ে কার্পেট। তার মাঝখানে ডবল-বেড খাটে নিভাঁজ বিছানা। এছাড়া রয়েছে বিশাল ওয়ার্ডরোবের একধারে ড্রেসিং টেবিল। খাটের পাশে নীচু স্ট্যান্ডের ওপর দু'টো টেলিফোন। একটা মোবাইলও। আর আছে নানা ধরনের ওষুধ।

মনোবীণা বললেন, 'এই বেডরুমটা ছিল আমার স্বামী আর আমার। তিনি চলে যাবার পর আমি একাই থাকি। এবার এগুলো ভালো করে বুঝে নাও—'

মনোবীণা স্ট্যান্ডের মাথায় যে-ওষুধগুলো রয়েছে, পর পর চিনিয়ে দিলেন। কোনওটা হার্টের, কোনওটা প্রেশারের, কোনওটা থাইরয়েডের, কোনওটা বুকের ব্যথার, কোনওটা ব্লাড সুগারের, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুগার তেমন না থাকলেও খেতে হয়।

চেনানো হলে মনোবীণা বললেন, 'রাত্তিরে আরতি আর মাধব থাকে না। এখন থেকে তুমি থাকবে। যদি হঠাৎ কোনও ক্রাইসিস দেখা দেয় ওষুধ খাওয়াতে হবে তো। তাই চিনিয়ে দিলাম। কোনটা কীসের ওষুধ, মনে থাকবে?'

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দিল পারমিতা—থাকবে।

এবার ঠিক পাশের ঘরটায় তাকে নিয়ে গেলেন মনোবীণা। কার্পেট, ওয়ার্ডরোব, এয়ারকুলার ইত্যাদি দিয়ে এটাও সাজানো। বললেন, 'এই ঘরটায় তুমি থাকবে। আমার পাশাপাশি তোমার থাকাটা খুব দরকার। তোমার ঘুম কি খুব গভীর?'

এরকম একটা প্রশ্নের পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে ভেবে পেল না পারমিতা। বেশ অবাক হয়েই সে মনোবীণার দিকে তাকায়।

মনোবীণা বললেন, 'কানের কাছে ঢাকঢোল বাজালেও অনেকের ঘুম ভাঙতে চায় না। তোমার ঘুম কি সেইরকম?'

ব্যাপারটা তবু পরিষ্কার হল না। পারমিতা জানায় তার ঘুম ততটা গাঢ় নয়।

'ভেরি গুড। রাত্তিরে কোনও কোনও দিন আমার হার্টের সমস্যাটা বেড়ে যায়। খুব বেশি কষ্ট হলে তোমাকে ডাকব। একটু সজাগ থেকো।'

সারাদিন অফিসে, লাঞ্চের আধঘণ্টা বাদ দিলে, সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল ছ'টা অবধি ভালো করে নিশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া যায় না। পুরো আট ঘণ্টা শিরদাঁড়া টান টান করে কাজ করে যেতে হয়। এতটা সময় খাটুনির পর যদি ফিরে এসে আবার রাত জাগতে হয়, শরীর কি সেই ধকল নিতে পারবে? কিন্তু কী আর করা যাবে? এত খোঁজাখুঁজির পর একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে। সেটা কোনওভাবেই খোয়ানো চলবে না। যত কষ্টই হোক, এই ফ্ল্যাট আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে। পারমিতা এবারও মাথা হেলিয়ে দেয়।—'সজাগ থাকব।'

মাঝখানের বেডরুমটা থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে শেষ ঘরটায় তাকে নিয়ে এলেন মনোবীণা। এটাও অন্য দু'টোর মতোই সাজানো-গোছানো। বললেন, 'এই ঘরটা আমার ছেলের। আশা করেছিলাম সে এসে থাকবে। কিন্তু না, কোনও দিনই আসবে না।' চোখে মুখে বিষাদ ছড়িয়ে পড়ে তাঁর।

নিজের অজান্তেই পারমিতা জিগ্যেস করে, 'তিনি কোথায় আছেন?'

মনোবীণা বললেন, 'আমেরিকায়।'

'কেন আসবেন না?'—বলতে গিয়েও থমকে গেল পারমিতা। মনে হল, প্রথম দিন এসেই এত কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক নয়।

ছেলের সম্বন্ধে আর একটি কথাও মনোবীণার মুখ থেকে বেরুল না। পুরো ফ্ল্যাটটা ঘোরা হলে বললেন, 'চল, তোমাকে আরেকটা জিনিস দেখাই।' মাধবকে ডেকে বললেন, 'বাইরের দরজাটা ভেজানো রইল। একটু নজর রাখিস। আমরা একটু বেরুচ্ছি। পনেরো-কুড়ি মিনিটের ভেতর ফিরে আসব।'

মনোবীণার ফ্ল্যাটটা সাততলায়। তার ওপরে ছাদ। লিফট সাততলা অবধি ওঠানামা করে। মনোবীণার ফ্ল্যাট থেকে ছাদে যেতে হলে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। পারমিতাকে সঙ্গে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে, হার্টের ওপর যাতে চাপ না পড়ে, সিঁড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে ছাদে চলে এলেন তিনি।

ছাদের আধখানা জুড়ে রুফ গার্ডেন। বাগানের তিন দিকে বুক-সমান উঁচু দেওয়াল। বাকি দিকটায় একই হাইটের তারের জালের বেড়া। ছাদের বাকি অর্ধেকটা ফাঁকা পড়ে আছে।

প্রায় একশো ফিট উচ্চতা থেকে চারিদিকে বহুদূর অবধি মহানগরের বিশাল বিস্তার নজরে পড়ে। দোতলা তেতলা চারতলা পাঁচতলা বাড়ি তো বটেই, উঁচু উঁচু কত যে হাই-রাইজ! ব্রিটিশ আমলের কত যে জমকালো সৌধ! তাছাড়া পার্ক, ঝকঝকে রাস্তা। শহর জুড়ে এখন তুমুল ব্যস্ততা। স্রোতের মতো নানা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে বাস-মিনিবাস-প্রাইভেট কার। যেদিকে তাকানো যায় মানুষের ঢল। অনেকখানি উঁচু থেকে বাস মিনিবাসগুলোকে খেলনা-গাড়ি মনে হয়। আর মানুষগুলো চলমান পুতুলের সারি। চিরকালের চেনা কলকাতাকে কেমন যেন অচেনা অচেনা লাগে।

তারের জালের বেড়ার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট গেট শেকল দিয়ে আটকানো। সেটা খুলে পারমিতাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন মনোবীণা।

বাগানের মাঝখানে সবুজ ঘাসের কার্পেট। সেটাকে ঘিরে অসংখ্য বনসাই, ক্যাকটাসও রয়েছে। রয়েছে বড় বড় পেতলের টবে বেঁটে বেঁটে নারকেল, পেয়ারা, আম, বাতাবি, পাতিলেবু, এমনি নানা ধরনের গাছ। সেগুলোর কোনও কোনওটায় ফল ধরেছে। আর রয়েছে অজস্র ফুলের গাছ। লাল হলুদ

গোলাপি সবুজ—সারা বাগান জুড়ে কত যে রঙের ফোয়ারা! দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মুগ্ধ পারমিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'বা, কী সুন্দর বাগান!'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মনোবীণা বললেন, 'তোমার ভালো লেগেছে?'

'চমৎকার।'

'জানো পারমিতা, আমার স্বামী আমাদের ফ্ল্যাটের সঙ্গে ছাদের অর্ধেকটা প্রোমোটারদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন, নানারকম শখ ছিল তাঁর। এই যে গার্ডেনটা দেখছ, নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। ফ্ল্যাটটাও মনের মতো করে সাজিয়েছেন। কত স্বপ্ন ছিল, শেষ জীবনটা সুন্দর ফ্ল্যাটে পড়াশোনা করে সময় কাটাবেন, আর সকাল-বিকেল বাগানের ফুল ফল ঘাস—এসব নিয়ে মেতে থাকবেন।'

পারমিতা শুনে যাচ্ছিল। কোনও উত্তর দিল না।

মনোবীণা বলতে লাগলেন, 'তাঁর একটা স্বপ্ন ছিল। আমাদের একমাত্র ছেলে সুব্রতর বিয়ে দেবেন। নিজের এক বন্ধুর মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে ঠিক করে রেখেছিলেন। মেয়েটি খুবই সুন্দরী, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, এম. এসসি'তে ফার্স্ট ক্লাস।' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন।

হাঁটতে হাঁটতে মনোবীণার মুখের দিকে তাকাল পারমিতা। মনে মনে সে যেন ভেবেই রেখেছিল, এই ফ্ল্যাটে যখন থাকতে এসেছে, ছেলের সম্বন্ধে মনোবীণা একদিন না-একদিন সব বলবেন। আধঘণ্টাও হয় নি, ছেলের কথা একবার উঠেছিল। তিনিই তুলেছিলেন। ভাবতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি সেই প্রসঙ্গ আবার উঠবে। এবারও কোনও প্রশ্ন করল না সে।

মনোবীণা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর ফের শুরু করলেন, 'মানুষের সব স্বপ্ন তো পূরণ হয় না। সুব্রত আমেরিকায় চলে গেল। সেখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে, আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে ওখানেই থেকে গেল। খুব শক পেয়েছিলেন আমার স্বামী। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। তারপর তো একদিন নিজেই চলে গেলেন।' তাঁর চোখে-মুখে করুণ, ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠল।

পারমিতা এবারও চুপ।

মনোবীণা বলতে লাগলেন, 'ছেলে কাছে নেই। স্বামী কবেই চলে গেছেন। আমি একা এখানে পড়ে আছি। স্বামীর স্বপ্নের এই বাসস্থান, তাঁর এত যত্নের বাগান—এসব ফেলে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। একটা বয়েসে পুরোনো স্মৃতি আর পুরোনো চেনা জায়গাই অবলম্বন হয়ে ওঠে। আমি তা-ই নিয়েই দিন কাটিয়ে যাচ্ছি।'

প্রাক্তন এই ভাইস প্রিন্সিপ্যালটিকে প্রথম দিন অত্যন্ত গম্ভীর আর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হয়েছিল। সেটা হয়তো তাঁর বাইরের আবরণ। পারমিতা অনুভব করল তাঁর মধ্যে একটি বেদনার্ত, বিষাদময়ী নারীও রয়েছে। সেটাই খুব সম্ভব তাঁর আসল পরিচয়।

মানুষের দুঃখের কথা শুনতে ভালো লাগে না পারমিতার। তার নিজেরই কত সমস্যা, কত সংকট। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য সে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'কর না—'

'আপনাকে মাসিমা বললে রাগ করবেন? মানে এক বাড়িতে থাকব—'

পারমিতাকে থামিয়ে দিয়ে মনোবীণা বললেন, 'সে কি, রাগ করব কেন? মাসিমাই তো বলবে।'

পারমিতা বলল, 'মেসোমশাই তো চলে গেছেন বেশ কয়েক বছর। এখনও বাগানটা ফুলে, ফলে, সবুজ ঘাসে ঝলমলে হয়ে আছে। নিশ্চয়ই কেউ এটা দেখাশোনা করে।'

মনোবীণা হাসলেন, 'কে আর করবে? আমিই হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসে যেটুকু পারি, করি। একটা মালি আছে, সপ্তাহে তার তিনদিন আসার কথা। ভীষণ ফাঁকিবাজ। মাঝে মাঝেই ডুব দেয়। কিন্তু গাছে রোজ জল না দিলে চলে? শুকিয়ে মরে যাবে যে—'

কী অফুরান আসক্তি নিয়ে মহিলা যে স্বামীর শখ, স্বপ্নকে আঁকড়ে বসে আছেন, ভেবে অবাক হচ্ছিল পারমিতা। নিশ্চয়ই বিবাহিত জীবন তাঁদেব খুব

সুখের ছিল। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভীষণ ভালোবাসতেন। হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়ে গেল। একটা অমানুষকে বিয়ে করেছিল সে। দাহ, গ্লানি আর প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছাড়া স্মৃতি বলতে সেই জীবনের অবশিষ্ট আর কিছুই নেই।

মনোবীণা বললেন, 'বাগানের পরিচর্যা করতে আমার কষ্ট হয়। যদিও লম্বা টিউবে করে জল দিই, তবু ঝুঁকে গাছের মরা ডালগুলো ছাঁটতে হয়। মাঝে মাঝে সার দিই। বড্ড হাঁপিয়ে পড়ি।'

'কষ্ট তো হবারই কথা।'

'ছুটির দিনে তুমি আমাকে হেল্‌প্‌ করবে?'

গাছপালা ফুল-টুল খুবই ভালোবাসে পারমিতা। আগ্রহের সুরে বলে, 'আমিও এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আপনি কাছে দাঁড়িয়ে থেকে কী কী করতে হবে বলবেন, আমি সব করে দেব।'

বাগান দেখানোর পর মনোবীণারা নীচে নেমে এলেন। বেলা বেড়ে গিয়েছিল। এখন প্রায় বারোটা।

মনোবীণা বললেন, 'দুপুরে একটার ভেতর আমি খেয়ে নিই। তারপর ঘণ্টা দুই-আড়াই ঘুমোই। সকালে আমার স্নান করার অভ্যাস। ওটা হয়ে গেছে। তুমি তোমার ঘরে চলে যাও। অ্যাটাচড বাথ আছে। তাড়াতাড়ি স্নান করে খাওয়ার টেবিলে চলে এস। আমি অপেক্ষা করছি।'

ব্রেকফাস্টের মতো দুপুরের খাবারও চমৎকার। জুঁই ফুলের মতো সরু চালের ভাত, বেগুনভাজা, সুক্তো, ঝিঙে-আলু দিয়ে পোস্ত, দু'রকমের মাছ—রুই আর কাজলি, টোমাটোর চাটনি আর টক দই।

খাওয়া-দাওয়া চুকলে মনোবীণা বললেন, 'এবার ওষুধ খেয়ে আমি শোব।'

দুপুরে তিনি কী কী ওষুধ খান, মনে করে রেখেছিল পারমিতা। মনোবীণার সঙ্গে তাঁর ঘরে এসে তিনটে ট্যাবলেট আর এক গেলাস জল তাঁকে দিল। মনোবীণা খুশি হলেন। বললেন, 'ওষুধগুলো চিনে রেখেছ দেখছি।'

পারমিতা একটু হাসল। কিছু বলল না।

মনোবীণা বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বললেন, 'যাও, তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর। ট্যাবলেট খেয়েছি, আমার চোখ এখনই বুজে আসবে।'

পাশের ঘরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পারমিতা। স্নানের আগে সুটকেস খুলে একজোড়া সালোয়ার-কামিজ বার করেছিল সে। এবার ধীরে-সুস্থে আরও ক'টা বার করল, সেই সঙ্গে কয়েকটা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট এবং টুকিটাকি কিছু সাজের জিনিস। পোশাকগুলো ওয়ার্ডরোবে গুছিয়ে রাখল সে। সেন্ট, লিপস্টিক, পাউডার ইত্যাদি রাখল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। দিবানিদ্রার অভ্যাস তার কোনও কালেই নেই। সকালের দিকে সেই সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধে অবধি তাকে তো অফিসেই কাটাতে হয়। আগে ছুটির দিনে দুপুরটা হোস্টেলে ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন পড়ে কাটিয়ে দিত। কিন্তু সুরজিৎ সেখানকার হদিস পাওয়ার পর সে আর হোস্টেলে থাকত না, সারাদিন একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে শহরের নানা প্রান্তে চরকিবাজির মতো ঘুরে বেড়াত।

মনোবীণার বেডরুমের মতো এই ঘরেও কাচে-ঢাকা র‍্যাকে প্রচুর বই রয়েছে। গল্প, উপন্যাস, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি নানা ধরনের বই। পছন্দমতো একটা গল্পের বই বার করে নিয়ে সে পড়তে পারত। কিন্তু ইচ্ছা করল না ; ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। এতদিন দুপুরে তো বটেই, রাত্তিরেও ভালো করে ঘুমোতে পারে নি পারমিতা। সারাক্ষণ এক আতঙ্ক তাকে তাড়া করে বেড়াত। আজ কিন্তু নিজের অজান্তেই দু'চোখ জুড়ে আসতে লাগল। হাজার বছরের ক্লান্তি যেন জমা হয়ে ছিল তার মধ্যে। লহমায় গভীর ঘুমের আরকে ডুবে গেল সে। না, আজ অন্তত কোনওরকম আতঙ্ক তাকে তাড়া করছে না। পারমিতা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। কী যে অপার স্বস্তি!

ঘুম যখন ভাঙল, বেলা পড়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে মুখটুখ ধুয়ে, চুলে ঝটিতি চিরুনি টেনে বাইরে এসে দেখে মনোবীণা ড্রইংরুমে বসে আছেন। কী একটা বই পড়ছেন।

মনোবীণার বাড়িতে আছে, অথচ তিনিই আগে জেগে গেছেন, আর সে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল—এতে ভেতরে ভেতরে খুবই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল

পারমিতা। পায়ে পায়ে মনোবীণার কাছে চলে এল। কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠতে দেরি হয়ে গেল।'

বই থেকে মুখ তুলে হাসলেন মনোবীণা।—'তাতে কিছু দোষ হয়নি। নিশ্চয়ই ভীষণ টায়ার্ড ছিলে। আমি উঠে তোমার ঘরে উঁকি দিয়েছিলাম, দেখি ঘুমোচ্ছ। তাই আর ডাকিনি। বোসো—'

মনোবীণা তার সংকোচ কাটিয়ে দিয়েছেন। তবু জড়সড় হয়ে সামনাসামনি একটা সোফায় বসে পড়ল পারমিতা।

মনোবীণা বললেন, 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এবার চা দিতে বলি।' গলা উঁচুতে তুললেন, 'আরতি, আমাদের চা—'

চা খেতে খেতে মনোবীণা জিগ্যেস করলেন, 'আমাদের এখানে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

এত আরামে এত স্বাচ্ছন্দ্যে এত আনন্দে মা-বাবা ছাড়া আর কারও কাছে থাকেনি পারমিতা। উচ্ছ্বাসে কত কথাই যে বুকের ভেতর থেকে ভিড় করে উঠে এল কিন্তু কিছুই বলা হল না। সুখে-শোকে-দুঃখে সে আলোড়িত হয় ঠিকই কিন্তু সেভাবে তার প্রকাশ নেই। পারমিতা অন্তর্মুখী, চাপা ধরনের মেয়ে। ভেতরটা যতই উথালপাতাল হোক, বাইরে তা প্রবল ধারায় বেরিয়ে আসতে দেয় না। তার স্বভাবটাই এইরকম।

পারমিতা আস্তে মাথা নাড়ল।—'না।'

'কোনও কিছু তোমার মনের মতো না হলে আমাকে জানিও। লজ্জা কোরো না।'

'আচ্ছা।'

এই ধরনের নানা কথাবর্তার মধ্যে চা খাওয়া শেষ হল। তারপর যে বইটা খানিক আগে পড়ছিলেন সেটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে মনোবীণা বললেন, 'আমার চোখটা মাঝে মাঝে গোলমাল করছে। ছোট হরফ পড়তে অসুবিধা হয়। তোমাকে একটু কষ্ট দেব।'

পারমিতা কোনও প্রশ্ন করল না। উন্মুখ হয়ে মনোবীণার দিকে তাকাল।

মনোবীণা বললেন, 'বইটা পড়ে শোনাও—' বলে হাতের বইটা

পারমিতাকে দিলেন। রাজশেখর বসু মূল মহাভারত কেটেছেঁটে যে-চমৎকার অনুবাদ করেছেন এটা সেই বই। একটা পৃষ্ঠা দেখিয়ে বললেন, 'এখান থেকে পড়।'

পারমিতা পড়তে লাগল। উচ্চারণ ভালো, কণ্ঠস্বর সুরেলা। ধীরে ধীরে পড়ছে সে।

মনোবীণা খুশি হলেন। বললেন, 'সংস্কৃত শ্লোকগুলো কারেক্ট উচ্চারণ করছ। তুমি কি এই ল্যাংগুয়েজটা জানো?'

পারমিতা বলল, 'বি. এ'তে আমার সংস্কৃত ছিল।'

'বা—'

ঘণ্টা দেড়েক পড়ার পর মনোবীণা বললেন, 'অনেকক্ষণ পড়া হয়েছে। আজ থাক। এখন থেকে ছুটির দিনে আমাকে পড়ে শোনাবে। শুধু মহাভারতই নয়, অন্য বইও।'

'নিশ্চয়ই শোনাব। এ তো আমার সৌভাগ্য।'

ড্রইংরুমের একধারে টিভি রয়েছে। রিমোট টিপে চালিয়ে দিতে দিতে মনোবীণা বললেন, 'আজকের নিউজটা শুনে এবং দেখে নেওয়া যাক।'

নিউজ দেখা হলে রিমোট টিপে টিপে কিছুক্ষণ ডিসকভারি চ্যানেল, কিছুক্ষণ হিস্ট্রি চ্যানেল ইত্যাদি দেখতে দেখতে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। এর মধ্যে এবেলার রান্না সেরে খাবার-দাবার গুছিয়ে রেখে, নিজেরটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে নিয়ে চলে গেছে আরতি। মাধবও তার খাবার নিয়ে গেছে। এখন এই বিশাল ফ্ল্যাটে পারমিতা আর মনোবীণা ছাড়া অন্য কেউ নেই।

মনোবীণা বললেন, 'ডাক্তার আমাকে রাত ন'টার ভেতরে খেয়ে নিতে বলেছেন। তুমি কখন খাও?'

'হোস্টেলে ন'টার মধ্যেই খাবার দিত।' পারমিতা এটুকুই শুধু বলল। তবে জানাল না, বেশ কিছুদিন সুরজিতের ভয়ে রাত এগারোটার আগে হোস্টেলে ঢুকত না। তারপর তো খাওয়া।

মনোবীণা ধরেই নিলেন, পারমিতাও ন'টার মধ্যেই খেয়ে নেয়। বললেন, 'ফাইন। চল ডাইনিং টেবিলে যাওয়া যাক।'

সন্ধের আগে রেঁধে রেখে গেছে আরতি। খাবারগুলো এতক্ষণে ঠান্ডা হয়ে গেছে। মনোবীণা মাইক্রো-ওভেনে সেসব গরম করতে যাচ্ছিলেন। করতে দিল না পারমিতা। তাঁকে জিগ্যেস করে করে নিজেই সব করে ফেলল। তারপর খাদ্যবস্তুগুলো ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে রেখে প্লেট, কাঁটা, চামচ এবং জলের গেলাস সাজিয়ে নিল।

মুখোমুখি বসে একসময় খাওয়া শুরু হল। যে যার দরকারমতো নানা পাত্র থেকে খাবার তুলে নিচ্ছে।

খেতে খেতে মনোবীণা বললেন, 'কত বছর যে সন্ধের পর থেকে একা একা পরদিন সকাল পর্যন্ত কাটিয়ে দিচ্ছি! রাত্তিরে নিজের খাবার নিজেকে গরম করে খেতে হয়। আজ একেবারে অন্যরকম লাগছে। আরও আগে যদি তোমার সঙ্গে দেখা হত!'

পারমিতা বলল, 'এখন থেকে অফিস আওয়ার্স ছাড়া যতক্ষণ এই ফ্ল্যাটে থাকব আপনার সব কিছু করে দেব।'

মনোবীণা যেন এটাই আশা করেছিলেন। স্নিগ্ধ চোখে কয়েক পলক সুশ্রী তরুণীটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গভীর স্বরে বললেন, 'দিও।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

পারমিতা ভাবছিল এত ভালো খাওয়া, অঢেল আরামে থাকা—এসবের জন্য কী দিতে হবে, এখনও জানাননি মনোবীণা। হঠাৎ সে কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল।

অনেকখানি দ্বিধার পর বারকয়েক ঢোক গিলে সে বলল, 'মাসিমা, আমার একটা কথা বলার ছিল—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল—'

মুখ নামিয়ে পারমিতা বলল, 'আমি এখানে থাকব, খাব। অনেক খরচ। আমাকে—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন মনোবীণা। একসময় তিনি ভেবে রেখেছিলেন যাকে এখানে থাকতে দেবেন তার কাছ থেকে কর্পোরেশনের ট্যাক্স আর মেনটেনান্স বাবদ বছরে বারো হাজার বারো হাজার অর্থাৎ মোট

চব্বিশ হাজার নেবেন। অর্থাৎ মাসে দু'হাজার করে। বললেন, 'তুমি কত স্যালারি পাও আমি জানি, হোস্টেল চার্জ কত দিতে হত তাও বলেছ, তার ওপর যাতায়াত ভাড়া, অন্য সব খরচ —সব মিলিয়ে সেভিংস বলতে তোমার কিছুই নেই। আমাকে তুমি কী দেবে, সেসব পরে ভাবা যাবে। এ-নিয়ে টেনশন কোরো না।'

'তবু —'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক পলক পারমিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন মনোবীণা। তারপর ঈষৎ কঠোর স্বরে বললেন, 'এক কথা দু'বার বলতে আমার ইচ্ছে করে না। তোমাকে তো বললামই, টাকাপয়সার ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।'

তাঁর ভেতর থেকে কড়া ভাইস-প্রিন্সিপ্যালটি বেরিয়ে এসেছে। পারমিতা আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস করল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর মনোবীণা বললেন, 'এবার টিভিতে সাড়ে ন'টার নিউজটা শুনে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

দু'জনে ড্রইংরুমে চলে এল। এ-সময় আধঘণ্টার সংবাদ দেখানো এবং শোনানো হয়। সেটা শেষ হলে ঠিক সাড়ে দশটায় টিভি বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন মনোবীণা। পারমিতাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

কখন মনোবীণা কী ওষুধ খান, ও-বেলাতেই জানা হয়ে গেছে। পারমিতা তাঁকে তিনটে ট্যাবলেট আর জল দিল। ওষুধ খেয়ে মনোবীণা জিগ্যেস করলেন, 'রাত্তিরে কখন তুমি শুতে যাও?'

পারমিতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তার ঠিক নেই। দশটা সাড়ে-দশটা হয়ে যায়।'

'ইচ্ছা করলে টিভি'র কোনও প্রোগ্রাম-ট্রোগ্রাম দেখতে পার। তারপর শুতে যেও।'

'টিভি দেখতে আমার খুব একটা ভালো লাগে না।'

'তোমার ঘরে বই-টই আছে। যতক্ষণ না ঘুম পাচ্ছে, পড়তে পার।'

'আচ্ছা।'

মনোবীণা শুয়ে পড়েছিলেন। আলো নিভিয়ে দিয়ে পারমিতা তার ঘরে চলে এল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল।

একসময় দু'চোখ জুড়ে এল ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যেই স্নায়ুগুলোকে সজাগ রাখল পারমিতা। পাশের ঘরে মনোবীণা হঠাৎ যদি অসুস্থ বোধ করেন কিংবা অন্য কোনও দরকারে তাকে ডাকেন, তক্ষুনি ছুটে যাবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। বহুকাল পর পুরো একটা দিন স্বপ্নের মতো কেটে গেল তার।

পাঁচ

দু'দিন ছুটি নিয়েছিল পারমিতা। একটা দিন শেষ হয়েছে। আরও একটা দিন তার হাতে আছে। আজ সকালে উঠে মনোবীণার সঙ্গে চা খেতে খেতে তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাল পারমিতা।

ঘণ্টাখানেক পর ব্রেকফাস্ট সারা হলে মনোবীণা বললেন, 'চল, ছাদে যাই। একদিন পর পর গাছে জল দিই। কাল দেওয়া হয়নি। আজ দিতে হবে।'

ছাদে বাগানের একধারে জলের কল রয়েছে। পারমিতা মনোবীণাকে কিছু করতে দিল না। তাঁর নির্দেশমতো কলের মুখে লম্বা রবারের টিউব লাগিয়ে সবুজ ঘাসে, ফুল এবং ফলের গাছে ছিটিয়ে ছিটিয়ে জল দিল সে। তারপর বড় কাঁচি দিয়ে কয়েকটা গাছের মরা পাতা আর শুকনো সরু ডাল ছেঁটে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রাখল। মালি এলে সেগুলো বাড়ির বাইরে ভ্যাটে ফেলে দিয়ে আসবে।

বাগানে জল দেবার জন্য টিউবই শুধু নেই। রয়েছে নানা ধরনের সরঞ্জাম এবং সারও। মনোবীণা এখানকার প্রতিটি গাছ এবং প্রতিটি ঘাস চেনেন। লক্ষ করলেন একটা বাতাবি লেবু আর একটা পেয়ারা গাছের সতেজ ভাব নেই, কেমন যেন রুগ্ণ। পারমিতাকে সারের বস্তা দেখিয়ে বললেন, 'ওগুলোর গোড়ায় একটু সার দাও। নইলে বেশিদিন বাঁচবে না।'

বাগানের পরিচর্যা শেষ হলে নীচে নেমে এসে ড্রইংরুমে বসে পড়ল দু'জনে। কাজটা অবশ্য পারমিতা করেছে কিন্তু সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে এবং নেমে আসতে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলেন মনোবীণা। ধকল সামলে উঠতে খানিকটা সময় লাগল। তারপর হেসে হেসে বললেন, 'তুমি দেখছি আমাকে একেবারে অথর্ব করে ফেলবে।'

চকিত পারমিতা মনোবীণার মুখের দিকে তাকায়। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'মানে, আমি ঠিক —'

মনোবীণা বললেন, 'আরে বাবা, তুমি তো আমার সব কাজকর্ম নিজের হাতে তুলে নিচ্ছ। এরপর তো হাত-পাও নাড়তে দেবে না। শরীরের কী হাল হবে বল। হাঁটুতে কোমরে কনুইতে রাস্ট পড়ে যাবে যে।' বলে হাসতে লাগলেন।

পারমিতাও হেসে ফেলল।

মনোবীণা লঘু সুরে বললেন, 'আমাকে তোমার সঙ্গে একটু আধটু বাগানের কাজ করতে দিও। বয়েস যতই হোক, হাত-পা না নাড়লে শরীর অকেজো হয়ে যায়।'

পারমিতা এবারও কিছু বলল না। মনোবীণাকে তার ক্রমশ ভালো লাগছে। তার মুখে হাসি লেগেই রইল।

মনোবীণা ফের কী বলতে যাচ্ছিলেন, কলিং বেল বেজে ওঠে। মাধব ওধারের একটা ঘরে কিছু করছিল, ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসে বাইরের দরজা খুলে দিল। পারমিতা লক্ষ করল, দরজার কাছে একটি মধ্যবয়সি সুপুরুষ চেহারার একজন দাঁড়িয়ে আছে। পরনে দামি ট্রাউজার্স এবং শার্ট। গায়ের রং টকটকে। চওড়া কপাল, নিখুঁত কামানো লম্বাটে মুখ। কাঁচাপাকা চুল ব্যাকব্রাশ করা।

লোকটি ড্রইংরুমে মনোবীণাকে দেখতে পেয়েছিল। বলল, 'ভেতরে আসব মাসিমা?'

মনোবীণা মুখ ফিরিয়ে দু-এক পলক লোকটিকে দেখলেন। তারপর নীরস গলায় বললেন, 'আসতে পার।'

পারমিতার চোখে পড়ল মনোবীণার ভুরু কুঁচকে গেছে, মুখচোখের ভঙ্গি কঠোর। একটু আগে হেসে হেসে ফুরফুরে মেজাজে তার সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই ভাবটা আর নেই। লহমায় পারমিতা আঁচ করে নিল, লোকটিকে তিনি পছন্দ করেন না। পারমিতা একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। তার অচেনা একজন ভিজিটর এসেছে। এখন কি বসে থাকা উচিত?

চলে যাবার জন্য মনোবীণা তাকে কিছু বলেন নি। উঠে গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তাই বেশ আড়ষ্ট হয়ে সে বসে রইল।

লোকটি ভেতরে এসে একটা সোফায় বসে পড়ল। পরমাত্মীয়য়ের মতো জিগ্যেস করল, 'ক'দিন আপনার খোঁজ খবর নিতে পারিনি। বিজনেসের ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। সকালে বেরিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা-এগারোটা হয়ে যাচ্ছিল। অত রাতে আপনাকে ডিসটার্ব করা ঠিক নয়। তা এখন কেমন আছেন?'

মনোবীণা বললেন, 'একই রকম চলে যাচ্ছে।'

'সপ্তাহখানেক আগে হার্টের ট্রাবলটা বেড়েছিল, সেটা কি একটু কমেছে?'

'ডাক্তার নতুন ওষুধ দিয়েছেন। ঠিক আছি।'

পারমিতা মনোবীণার দিক থেকে চোখ সরায় নি। সে আগেই টের পেয়েছিল, লোকটা আসায় তিনি খুশি হন নি। তাঁর চোখে-মুখে অসন্তোষ আরও প্রকট হচ্ছে। এটাও বোঝা যাচ্ছিল, এই যে লোকটা পরম হিতাকাঙ্খীর মতো মনোবীণার শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিলেন সেটা নেহাতই কথার কথা। এসব খবর নেওয়ার পেছনে তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে।

লোকটি একটু ঝুঁকে বলল, 'কিডনির একটা সমস্যা ছিল। সেটা—'

মনোবীণা বললেন, 'ওষুধ খেয়ে চলেছি। যতটা সুস্থ থাকা যায়, তার চেষ্টা চলছে।'

'মাঝে মাঝে হাঁটুতে ঘাড়ে আরথ্রাইটিসের পেন হয়। তার কী ব্যবস্থা হল?'

'ডাক্তার সেসবেরও ওষুধ দিয়েছেন।'

'আর চোখের ব্যাপারটা? প্রায়ই চোখ থেকে জল পড়ে। ঝাপসা দেখেন। ওটা নেগলেক্ট করা ঠিক নয়।'

লোকটি ঝরঝরে নির্ভুল বাংলা বলছে। তবু কোথায় অন্যরকম একটা টান রয়েছে। পারমিতার মনে হল, সে অবাঙালি, অনেককাল কলকাতায় আছে।

মনোবীণা লোকটির শেষ কথাগুলোর উত্তর দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

লোকটি নাছোড়বান্দা। বলল, 'আপনার হাউস ফিজিসিয়ানের ওষুধ যেমন খাচ্ছেন খান। চোখটা ভালো জায়গায় দেখানো দরকার। আমার জানাশোনা একজন স্পেশালিস্ট আছেন। তাঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব? আপনি অনুমতি দিলে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' বলে গভীর আগ্রহে মনোবীণার দিকে তাকাল।

মনোবীণার মুখেচোখে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'হরীশ, তুমি যেজন্যে এসেছ, সেটাই বল। আমার হার্ট, আরথ্রাইটিস, চোখের সমস্যা নিয়ে তোমাকে না ভাবলেও চলবে। নিজের শরীরিক সমস্যা নিজেই সামলে নিতে পারব। কলকাতায় অনেক বড় বড় ডাক্তারকে একটু আধটু চিনি। আমার যাঁরা ট্রিটমেন্ট করছেন তাঁরাও বিরাট বিরাট স্পেশালিস্ট।'

লোকটি অর্থাৎ হরীশ এতটুকু অপ্রতিভ হল না। বলল, 'আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি মাসিমা। আপনি যখন অন্য ডাক্তার-টাক্তারে ইন্টারেস্টেড নন তখন ওটা থাক।' একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলেন, 'সেই বিষয়টা নিয়ে কিছু ভাবলেন?'

মনোবীণা অদ্ভুত হাসলেন, 'যাক, এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আমার চোখ কিডনি হার্ট টার্ট নিয়ে তোমার এত যে চিন্তা সেটা বাহানামাত্র। তাই না?'

হরীশ লেশমাত্র অপ্রতিভ হল না। বলল, 'মোটেই বাহানা নয়। মাসিমা সত্যিই আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। সেইজন্য সবসময় দুর্ভাবনায় থাকি।'

'আমার জন্যে দুর্ভাবনাটা না-ই করলে।'

'আপনি আমাকে দুঃখ দিচ্ছেন মাসিমা।'

'ওসব দুঃখ টুঃখর কথা থাক। যে-কারণে তুমি রেগুলার আসছ সে-সম্বন্ধে আমি এখনও'পর্যন্ত কিছুই ভাবি নি।'

একটু নীরবতা।

তারপর খুব নরম গলায় হরীশ বলল, 'আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমেরিকায় ছেলের কাছে আপনার চলে যাওয়া উচিত। এখানে, এই বয়েসে একা একা থাকা ঠিক নয়।'

'তুমি মাঝে মাঝে এসে যে এই পরামর্শটা দাও, সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আগেও বলেছি, আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।'

'দুশ্চিন্তা না করে কি পারা যায়? কারণ আপনি আমার মাসিমা। তা ছাড়া আপনাকে যে প্রাইস দিতে চেয়েছিলাম, তার থেকে আরও দশ লাখ বেশি দেব।'

কঠোর স্বরে মনোবীণা বললেন, 'তুমি আমাকে টাকার লোভ দেখিও না। এসব আমার পছন্দ নয়।'

মনোবীণা যে রেগে গেছেন তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুই গায়ে মাখল না হরীশ। হেসে হেসে বলল, 'আপনার বয়েস হয়েছে মাসিমা। আমার কথাগুলো আপনার পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু এখানে একা থাকা কিছুতেই সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় না গিয়ে আপনি পারবেন না।'

মনোবীণার হঠাৎ খেয়াল হয়, পারমিতা কাছেই বসে আছে। তিনি তাকে দেখিয়ে হরীশকে বললেন, 'আমি একা নই, এই মেয়েটিও এখন থেকে আমার কাছে থাকবে।'

হরীশ চকিত হয়ে ওঠে। এতক্ষণ সে পারমিতাকে প্রায় লক্ষই করে নি। এবার ঠান্ডা চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মনোবীণার দিকে ফিরে বলে, 'ইনি কে?'

মনোবীণা বললেন, 'তা দিয়ে তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।'

হরীশ আর বসল না। উঠে পড়তে পড়তে বলল, 'ঠিক আছে, ওঁর পরিচয় যখন জানাতে চান না, এ-নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করব না। একই বিল্ডিংয়ে যখন আমরা থাকব, পরিচয়টা একদিন নিশ্চয়ই জানতে পারব। আচ্ছা চলি মাসিমা। আমার প্রাইসটা মনে রাখবেন। বাজারে যা দাম চলছে তার দেড় গুণ বেশি।'

হরীশ চলে যাবার পর ড্রইংরুমে নীরবতা নেমে আসে। পারমিতারা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

একসময় মনোবীণা জিগ্যেস করলেন, 'লোকটাকে কেমন দেখলে?'

হরীশকে মোটেও ভালো লাগেনি পারমিতার। হিতাকাঙ্ক্ষীর মুখোশ পরে আছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ধূর্ত, ধড়িবাজ। আবছাভাবে তার মনে হয়েছে, মনোবীণার কাছ থেকে কিছু একটা বাগিয়ে নিতে চাইছে। অবশ্য তার জন্য দামও দেবে।

পারমিতা একটু চিন্তা করে বলল, 'চতুর লোক।'

'চতুর কী বলছ! হাড় বজ্জাত। যখনই আসে মুখ থেকে মধু ঝরতে থাকে। যেন আমার পরমাত্মীয়। কিন্তু মাথার ভেতরে ফন্দি গিজগিজ করছে।' মনোবীণা এরপর যা বললেন তা এইরকম। হরীশ যার পুরো নাম হরীশ টোডি, এই বিল্ডিংয়েরই চারতলায় থাকে। মনোবীণার ফ্ল্যাট আর রুফ গার্ডেনটার ওপর তার নজর পড়েছে। এই প্রপার্টিটা ও দখল করতে চায়। সেজন্য মাঝে মাঝে প্রচুর টাকার লোভ দেখায়।—'কিন্তু আমার স্বামী ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে এত কষ্ট করে এটা কিনেছিলেন, কত যত্ন করে সাজিয়েছেন। আমি কিছুতেই ছাড়ব না।' একটু থেমে ফের বললেন, 'লোকটা ভালো নয়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমাকে কড়া স্টেপ নিতে হবে।'

পারমিতা উত্তর দিল না। মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। এতকাল পর মাথা গোঁজার মতো নিরাপদ একটা জায়গা পেয়েছিল। সেখানেও হরীশ টোডির মতো অতি ধুরন্ধর, ফন্দিবাজ একটা লোক রয়েছে। মনোবীণা কড়া ধাতের মানুষ, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যতই যা হোন, তিনি একজন মহিলা, তার ওপর নানা ধরনের রোগে ভুগছেন, যথেষ্ট বয়সও হয়েছে। কতদিন হরীশ টোডিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, কে জানে।

এই আশ্রয় কিছুতেই ছাড়তে চায় না পারমিতা। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।

ছয়

হরীশ টোডির মতো একটা বাজে, বিরক্তিকর লোক একই বিল্ডিংয়ে থাকলেও দেড়টা মাস মনোবীণার কাছে চমৎকার কেটে গেল। বিঘ্নহীন, নিশ্চিন্ত জীবন।

অফিসের কয়েক ঘণ্টা ছাড়া বাকি সময়টা মনোবীণার সঙ্গেই কাটিয়ে দেয় পারমিতা। সকালে তাঁর সঙ্গে বসে চা খায়, খবরের কাগজ পড়ে শোনায়, তারপর স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে মনোবীণাকে ওষুধ খাইয়ে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধেবেলায় ফিরে দু'জনে টিভি'র নিউজ দেখে। মনোবীণার চোখের সমস্যাটা আরও একটু বেড়েছে। কিন্তু বই না পড়ে থাকতে পারেন না। টিভি দেখা হলে ঘণ্টাখানেক তাঁর পছন্দমতো বই পড়ে শোনায় পারমিতা। তারপর ডিনার। ডিনারের পর মনোবীণাকে ওষুধ খাওয়ানো। তিনি শুয়ে পড়লে নিজের ঘরে চলে আসে সে। সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে এই হল তাদের দৈনন্দিন রুটিন।

ছুটির দিনে কোথাও বেরুবার থাকে না পারমিতার। তখন সারা দিন ছায়ার মতো সকাল থেকে রাত অবধি মনোবীণার সঙ্গে সঙ্গে থাকে সে। সেদিনটা অফুরন্ত অবসর। প্রচুর গল্প করে দু'জনে। ছাদে গিয়ে বাগানের গাছগুলোতে জল দেয়, সার দেয়।

একসময় রান্নার খুব শখ ছিল পারমিতার। মায়ের কাছ থেকে নানা ধরনের সুস্বাদু মুখরোচক খাবার, মাছের নানা পদ রাঁধতে শিখেছিল। শ্বশুরবাড়ির অসুখী জীবন, হোস্টেলের জঘন্য পরিবেশে ক'টা বছর কাটানো—এর মধ্যে রান্নার কোনও প্রশ্নই ছিল না।

'মৈনাক'-এ আসার পর পুরোনো শখটা নতুন করে পারমিতাকে পেয়ে বসেছে। ছুটির দিনে আরতির কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য কিচেনের দায়িত্ব নিয়ে দু-একটা পদ রাঁধে সে। খেয়ে তারিফ করেন মনোবীণা। জিগ্যেস করেন, 'এত ভালো রান্না কোথায় শিখলে?'

পারমিতা বলে, 'মা শিখিয়েছিল।'

আসলে প্রতি মুহূর্তে মনোবীণাকে খুশি রাখতে চায় সে। আনন্দে রাখতে চায়। এই বয়স্ক মহিলাটি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, অপার স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন। এসবের বদলে তারও তো কিছু করা দরকার। তা ছাড়া মনোবীণার ভালো থাকার মধ্যে তার নিজেরও বড় স্বার্থ আছে। তিনি আনন্দে থাকলে এই ফ্ল্যাটে সে নিরাপদে কাটিয়ে যেতে পারবে। যেটা প্রয়োজন তা হল তাঁকে সুস্থ রাখা।

এই দেড়মাসে একবারই সামান্য সুর কেটে গিয়েছিল। পারমিতা ভয়ে ভয়ে টাকার কথা তুলেছিল। এই ফ্ল্যাটে অঢেল আরামে থাকে সে, খাওয়া-দাওয়া চমৎকার। কিন্তু কাগজের বিজ্ঞাপনে শর্ত ছিল মাসের শেষে কিছু অর্থ দিতে হবে।

টাকার কথা শুনে রেগে গেছেন মনোবীণা।—'এর আগেও তুমি এ নিয়ে বলেছ কিন্তু এসব আমি পছন্দ করি না। তোমার মেসোমশায় অনেক টাকা রেখে গেছেন, আমার নিজেরও প্রচুর আছে। ব্যাঙ্ক থেকে যে ইন্টারেস্ট পাই আর গভর্নমেন্ট যে পেনশন দেয় তাতে তোমার মতো পঁচিশটা মেয়েও যদি এই ফ্ল্যাটে থাকে, আমার অসুবিধা হবে না। তোমার কিছু দেবার দরকার নেই। মাইনে যা পাও তার থেকে বেশির ভাগটা ভবিষ্যতের জন্যে জমিয়ে রাখ।'

আর কোনওদিন টাকার কথা তুলতে সাহস হয়নি পারমিতার।

হরীশ টোডি লোকটা নির্লজ্জ, গায়ের চামড়া তিন ইঞ্চি পুরু। সে এলে মনোবীণা যে খুশি হন না সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়েও দেন। কিন্তু তাঁর অসন্তোষ, বিরক্তি গায়ে মাখে না হরীশ। পাঁচ-সাতদিন পর পর এসে হাজির হয়েছে। মনোবীণা যতই রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দেন, সে শুধু হাসে। গা থেকে

সব অসম্মান, অনাদর ঝেড়ে ফেলে আবার এসে হাজির হয়। এমন দু-কান কাটা লোক আগে আর কখনও দেখেনি পারমিতা।

এসব যেমন আছে তেমনি পারমিতার একটা সঙ্গোপন দুঃখের দিকও রয়েছে। ডিভোর্সের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে চিরকালের মতো বেরিয়ে এসে বিভাবতীদের বাড়ি হয়ে উইমেনস হোস্টেলে ক'টা বছর কাটিয়ে দিয়েছে। এই সময়টা প্রতিদিন রাত্তিরে সুটকেস থেকে ছেলের ফোটো বার করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত সে। ছেলেটাকে তার শাশুড়ি স্মৃতিরেখা কেড়ে নিয়েছেন, যাতে তার কাছাকাছি সে না যেতে পারে সেজন্য ধরাছোঁয়ার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছেলের ফোটো দেখতে দেখতে দু'চোখ জলে ভরে যেত পারমিতার। 'মৈনাক'-এ আসার পরও রোজ রাত্তিরে চারিদিক যখন নিঝুম হয়ে যায়, শুয়ে শুয়ে ছেলের ফোটোর দিকে কতক্ষণ যে তাকিয়ে থাকে!

মাসদেড়েক পর একদিন ডিনার সেরে মনোবীণার সঙ্গে তাঁর বেডরুমে গিয়ে অন্য সব দিনের মতো তাঁকে তিনটে ট্যাবলেট খাইয়ে পারমিতা বলল, 'এবার শুয়ে পড়ুন।'

মনোবীণা শুলে তাঁর গায়ে সযত্নে একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে দিল পারমিতা। তারপর নিজের ঘরে চলে এল। পরনের সালোয়ার কামিজ ছেড়ে ঢিলেঢালা রাতপোশাক পরে ছেলের ফোটো বার করে শুয়ে পড়ল সে। ফোটোটা সোনার আড়াই বছর বয়সের। তারপর কত দিন কেটে গেল। সোনা এতদিনে অনেকটা বড় হয়েছে। চেহারাও নিশ্চয়ই খানিকটা বদলে গেছে। কেমন হয়েছে তাকে দেখতে? পারমিতা জানে না। বড় দেখতে ইচ্ছা করছে সোনাকে। কিন্তু এ-জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দু'চোখ বাষ্পে ভরে যায় পারমিতার। নিজের অজান্তে একসময় অঝোরে গাল বেয়ে জল ঝরতে থাকে। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল ; বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। ফোটোটা বুকের ওপর চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

অবিরল কেঁদেই চলেছে পারমিতা। কান্নার দমকে সারা শরীর ফুলে ফুলে

উঠছে। সে যে অন্যের বাড়িতে আছে, নিঝুম রাতে সামান্য আওয়াজে মনোবীণার ঘুম ভেঙে যাবে, সেই খেয়াল রইল না। নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছে না সে।

কতক্ষণ কেঁদেছিল পারমিতা জানে না। একটা কোমল কণ্ঠস্বর কানে যেতে চকিত হল সে। তার নাম ধরে কেউ ডাকছে। ধড়মড় করে উঠে বসতেই দেখতে পেল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন মনোবীণা।

বিহ্বলের মতো কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকে পারমিতা। তারপর দ্রুত চোখ মুছে বলে, 'আপনি!'

মনোবীণা একদৃষ্টে পারমিতাকে দেখতে লাগলেন। উত্তর দিলেন না।

পারমিতা খাট থেকে নেমে পড়ল। বলল, 'আপনি ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলেন। ঘুম না হলে শরীর ভীষণ খারাপ হবে। চলুন, আপনাকে আপনার ঘরে দিয়ে আসি।'

মনোবীণা তার কথা যেন শুনতেই পান নি। ভেতরে এসে পারমিতার খাটের একধারে বসে বললেন, 'বোসো।'

আড়ষ্টের মতো বসে পড়ল পারমিতা। মনোবীণা অসুস্থ মানুষ, হার্টের রোগী। মাঝরাতে ঘুম ভাঙানোর জন্য তিনি কতটা রেগে গেছেন বা কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আন্দাজ করতে চেষ্টা করল। ভয়ে ভয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

মনোবীণা পারমিতার মুখ থেকে চোখ সরান নি। ধীরে ধীরে জিগ্যেস করলেন, 'কাঁদছিলে কেন? কী হয়েছে?'

পারমিতা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তার কান্নাকাটির জন্যই যে জেগে উঠে মনোবীণা চলে এসেছেন, সেজন্য সংকোচে মাথা কাটা যাচ্ছিল তার। নতচোখে চুপচাপ বসে রইল সে।

মনোবীণা ফের বললেন, 'কী হয়েছে, বললে না তো—'

কান্নার বেগ আবার উথলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে প্রাণপণে সেটা ঠেকাতে চেষ্টা করছে পারমিতা। একসময় ধরা গলায় বলল, 'না, কিছু হয়নি।'

মনোবীণা মৃদু হাসলেন, 'কিছু না হলে, রাতদুপুরে শুয়ে শুয়ে কেউ ওভাবে কাঁদে? আমার কাছে লুকিও না।' বলে পারমিতার পিঠে একটা হাত রাখলেন।

মনোবীণার স্পর্শে এমন কিছু ছিল—সহানুভূতি বা মমতা—যাতে ফের রুদ্ধ কান্নাটা সব বাধা ছিঁড়েখুঁড়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল।

মনোবীণা তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'কেঁদো না, কেঁদো না, শান্ত হও। আমাকে সব খুলে বল। কোনও সমস্যা হলে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সোনার ফোটোটা মনোবীণার হাতে দিল পারমিতা।

পলকহীন মুগ্ধ চোখে ফোটোটা অনেকটা সময় ধরে দেখলেন মনোবীণা। কার ছবি, এর মধ্যে তিনি আন্দাজ করে নিয়েছেন। বললেন, 'কী ফুটফুটে বাচ্চা। নিশ্চয়ই তোমার ছেলে।'

আস্তে মাথা নাড়ল পারমিতা।

মনোবীণা ভারি নরম স্বরে এবার বললেন, 'ছেলের জন্যে মন খারাপ করছিল?'

ঝাপসা, কান্নাজড়ানো গলায় পারমিতা বলল, 'হ্যাঁ।'

'মনে পড়ছে তুমি বলেছিলে, ছেলের সঙ্গে তোমার যাতে দেখা না হয় সেজন্যে তোমার শাশুড়ি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। কার্শিয়াং-এ।'

'দিস ইজ ইন-হিউম্যান। সম্পূর্ণ বে-আইনি। ছেলেকে মা দেখতে পাবে না, এই ক্রুয়েলটির কোনও তুলনা নেই। ভদ্রমহিলা মানুষ, না পশু?'

জোরে শ্বাস টেনে পারমিতা বলল, 'কষ্টে ছেলেটাকে কতদিন দেখি না। আমার হাড়পাঁজর যেন ভেঙে যায়।'

মনোবীণা বললেন, 'প্রথম দিনই তোমাকে বলেছিলাম, ছেলের ওপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ওইটুকু বাচ্চা মা ছাড়া কি থাকতে পারে? তুমি ওকে নিজের কাস্টোডিতে নিয়ে আসছ না কেন?'

পারমিতা জানায়, 'ডিভোর্সের পর যা যা হয়েছে, সব আপনাকে বলেছি। চাকরির জন্যে বাইরে থাকতে হয় অনেকটা সময়। বাচ্চাটাকে তখন কে দেখবে? কে তার যত্ন করবে? তাই—'

'মায়ের কাছ থেকে তার বাচ্চা আলাদা হয়ে থাকবে, তা কখনও হতে পারে না।'

কিন্তু সমস্যা যে অনেক। সোনাকে পাব কী করে?'

'কোর্টে কেস করবে। আদালত মায়ের দাবিকে মর্যাদা দেবেই দেবে।'

এই সব কথা খুব সম্ভব আগেও বলেছেন মনোবীণা। পারমিতার মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে, 'আমি কত স্যালারি পাই, আপনি জানেন। সমরেশরা বিশাল বড়লোক। মামলা করতে প্রচুর টাকা দরকার। কতদিন তা চলবে, ঠিক নেই। আমি অত টাকা কোথায় পাব?'

একটু ভেবে মনোবীণা বললেন, 'কেস আর টাকা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। সেটা আমি দেখব। এই নিষ্ঠুরতা কোনওভাবেই সহ্য করা যায় না।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে পারমিতা। মাসদুয়েক হল সে এখানে এসেছে। তার ছেলেকে তার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য আদালতে যাবার ব্যবস্থা করবেন মনোবীণা, অজস্র টাকা খরচ করতেও তিনি প্রস্তুত। সবটাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। মনোবীণার মতো মানুষ আগে কখনও দেখেনি সে। অভিভূত পারমিতা কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

মনোবীণা বললেন, 'একটা সমস্যা তো জানা গেল। দু' নম্বরটা কী?'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠতে একটু সময় লাগল। তারপর পারমিতা বলল, 'কেসে না হয় আপনার জন্যে শেষ পর্যন্ত জিতলাম। কিন্তু জেতার পর?'

মনোবীণা বেশ অবাক হলেন।—পরে কী?'

'বাচ্চাটাকে কোথায় এনে রাখব?'

'কেন, তুমি যেখানে আছ সেখানেই।'

কানে শুনেও যেন বিশ্বাস হয় না পারমিতার। বিস্ময় কাটলে জিগ্যেস করে, 'আপনি কি এই ফ্ল্যাটে থাকার কথা বলছেন?'

মনোবীণা হাসলেন।—'আমাদের এই ফ্ল্যাটটা এত ছোট নয় যে একটা পাঁচ ছ'বছরের বাচ্চার জায়গা হবে না। তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে তো আলাদা কথা।'

কিছু একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করে পারমিতা। কিন্তু গাঢ় আবেগে গলা বুজে আসে। পরক্ষণে কী যে হয়ে যায় তার! মনোবীণার কোলে মুখ রেখে কেঁদে ফেলে। ছোট্ট বালিকার মতো অঝোরে কাঁদতেই থাকে।

'আবার কাঁদে?' পারমিতাকে ধীরে ধীরে তুলে বসিয়ে দেন মনোবীণা। বলেন, 'তুমি তো মা। কোনও কান্নাকাটি নয়। সন্তানকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে ; সেই কাজটা করতে কঠিন যুদ্ধের জন্যে মনে মনে নিজেকে তৈরি কর।'

পারমিতা চুপ করে থাকে।

মনোবীণা বিছানা থেকে নামতে নামতে এবার বলেন, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন শুয়ে পড়। কাল আবার অফিস আছে। আমারও আর জেগে থাকা ঠিক নয়। শরীর খারাপ হলে তার ধাক্কা সামলাতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। যাই—' পারমিতার মুখে আদরের ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

সাত

দিন তিনেক পর অফিস থেকে ফিরে পারমিতা দেখল ড্রইংরুমে মুখোমুখি সোফায় বসে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন মনোবীণা। আগন্তুকের বয়স ষাট-বাষট্টি। একটু ভারী ধরনের চেহারা। চওড়া কপাল। কাঁচাপাকা ঘন চুল ব্যাকব্রাশ করা। পুরু ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখের দৃষ্টি এতই তীক্ষ্ণ, মনে হয় যে-কোনও মানুষের দিকে একবার তাকালে তার মধ্যে কোনও গোপন অভিসন্ধি রয়েছে কিনা, নিমেষে ধরে ফেলতে পারেন। পরনে দামি ট্রাউজার্স আর শার্ট।

মনোবীণা পারমিতাকে ডাকলেন।—'এখানে এসে বোসো। তোমার জন্যেই আমরা ওয়েট করছি।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে কোণের দিকের একটা সোফায় নিঃশব্দে বসে পড়ল পারমিতা। তার চোখ বার বার অপরিচিত ভদ্রলোকটির দিকে চলে যাচ্ছিল।

মনোবীণা বললেন, 'আগে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল হাইকোর্টের বিখ্যাত ল'ইয়ার সুধাময় চট্টরাজ। সুধাময় আমাদের পারিবারিক বন্ধু। তা ছাড়া আমাদের আইনুঘটিত নানা সমস্যার দিকগুলো দেখে। আর ও হল পারমিতা। আমার মেয়েই বলতে পারো। এর কথাই এতক্ষণ তোমাকে বলছিলাম।' সুধাময় তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট, তা ছাড়া অনেকদিন ধরে তাঁকে দেখছেন সেই সূত্রে তুমি করেই বলেন মনোবীণা।

হাতজোড় করে পারমিতা সুধাময়কে নমস্কার করে। সুধাময় শুধু ভদ্রতাসূচক একটু মাথা নাড়লেন।

মনোবীণা এবার পারমিতাকে বললেন, 'সারাদিন কাজ করে এসেছ। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে পোশাক চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে এখানে চলে এস। আমি আরতিকে চা দিতে বলছি।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে এল পারমিতা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরতি শুধু চা-ই না, প্রচুর মিষ্টি এবং নোনতা খাবারও নিয়ে এল। সবই বাড়িতে তৈরি।

সুধাময় একটা সিঙাড়া তুলে নিলেন। মনোবীণা খুবই স্বল্পাহারী, তিনি শুধু চায়ের কাপ নিলেন। পারমিতার ভীষণ খিদে পেয়েছিল। সে প্রথমে নিল নিমকি, তারপর পাটিসাপটা।

খেতে খেতে মনোবীণা সুধাময়কে বললেন, 'পারমিতার সম্বন্ধে আমি যতটা শুনেছি, তোমাকে সব বলেছি। মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে কেড়ে নেবে, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। টাকার জন্যে চিন্তা করো না।' শেষ বয়েসে জীবন যখন নীরস, গতানুগতিক, দিনের পর দিন শুধু ওষুধ খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকা, সেইসময় আচমকা একটা কাজের মতো কাজ যেন পেয়ে গেছেন তিনি। পারমিতার মতো একটা দুঃখী মেয়ের হাতে তার ছেলেকে যদি তুলে দিতে পারেন সেটা তাঁর কাছে বিরাট এক তৃপ্তি।

মনোবীণা যে সুধাময়কে ডেকে এনেছেন তা তো বোঝাই যাচ্ছিল। উদ্দেশ্যটা কী তাও অস্পষ্ট নয়। পারমিতা নীরবে ওঁদের দু'জনকে লক্ষ করতে লাগল।

সুধাময় সিঙাড়া শেষ করে রাঙা আলুর পুলি এবং পাটিসাপটায় মনোযোগ দিয়েছেন। মনে হয়, খেতেটেতে খুবই ভালোবাসেন। আলুর পুলির অর্ধেকটা কেটে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে তিনি পারমিতার দিকে তাকান। বলেন, 'মিসেস লাহিড়ি আপনার কথা বলেছেন। খুবই দুঃখের ব্যাপার। যাই হোক, কেস করতে গেলে সমস্ত কিছু সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। পারমিতা, তুমি আমার মেয়ের বয়েসি। তুমি করেই বলব কিন্তু।'

পারমিতা ব্যস্তভাবে বলল, 'তুমিই তো বলবেন।'

'মিসেস লাহিড়ি আমাকে তোমার সম্বন্ধে প্রায় সবই বলেছেন, তবু তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। তার উত্তর দাও। আসলে মিসেস লাহিড়ি তোমার কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি আমাকে বলার সময় কিছু বাদ গেছে কিনা জানতে চাই।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পারমিতার বাপের বাড়ি, বিয়ে, শ্বশুরবাড়িতে দাম্পত্য

জীবন, ডিভোর্স, জোর করে ছেলেকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, ছাড়াছাড়ির পর দুঃসহ জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে সব জেনে নিলেন সুধাময়। সুরজিতের ব্যাপার ছাড়া বাকি সমস্ত অকপটে জানিয়ে দিল পারমিতা। শুধু সুরজিতের প্রসঙ্গটা বাদ দিল এই কারণে, একে ছেলের জন্য মনোবীণা যা করতে চলেছেন তার অন্য কোনও নজির আছে কিনা পারমিতার জানা নেই। একটা সমস্যা তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তার ওপর সুরজিতের প্রসঙ্গটা যদি জানানো হয় তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। ভাববেন এই মেয়েটা অদৃশ্য ঝাঁপি খুলে একের পর এক কত রকমের ঝঞ্ঝাট বার করে আনবে, কে জানে। কাজেই সুরজিতের ব্যাপারটা আপাতত চাপা থাক। পারমিতার দুশ্চিন্তা অবশ্য পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায় নি। রাস্তায় তাকে বেরুতেই হয়। কোনদিন সুরজিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এবং সে ' মৈনাক'-এর এই ফ্ল্যাটে চলে আসবে সেরকম একটা গোপন টেনশন তার আছেই। ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে আপাতত ভাবছে না পারমিতা। যদি সুরজিতের বিষয়টা জানাজানি হয়, যা হওয়ার হবে।

যাই হোক, সুধাময়ের মুখচোখ দেখে মনে হল, তিনি সন্তুষ্ট। বললেন, 'তোমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে যে দুর্ব্যবহার করা হত, তার সাক্ষী পাওয়া যাবে?'

কিছুক্ষণ ভেবে পারমিতা বলল, 'কাজের লোকেরা সব দেখেছে। তারা সাক্ষি দেবে বলে মনে হয় না। তবে আমি ওখানে থাকতে থাকতেই চুরির দায়ে দু'জনকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সৎ মানুষ ছিল। শুনেছি ওরা অপমান ভুলতে পারেনি। রাগ পুষে রেখেছে। তারা সাক্ষি দিতে পারে।'

'গুড। এদের ঠিকানা জানো?'

'মোটামুটি জানি। ভবানীপুরে যদুবাবুর বাজারের পেছনে আধাবস্তি মতো একটা জায়গায় থাকে। লোকে বলে হরনাথ বসাকের বস্তি। খুঁজে বার করতে অসুবিধা হবে না।'

'ঠিক আছে, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন—' উৎসুক চোখে তাকায় পারমিতা।

'আমাকে যা বলেছ, গুছিয়ে চার-পাঁচ দিনের ভেতর সব লিখে ফেলবে। ওটা পেলে কেস সাজাতে আমার সুবিধা হবে।'

'ঠিক আছে, লিখে ফেলব।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন—'

'যদুবাবুর বাজারে গিয়ে সেই লোকদু'টোকে অবশ্যই কয়েক দিনের ভেতর খুঁজে বার করবে। ওরা আই-উইটনেস ; নিজেদের চোখে সব দেখেছে। ওদের সাক্ষির দাম অনেক। আদালত তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় পারমিতার। সে ব্যগ্র সুরে বলে, 'আরও একজন আছে, সে সমরেশদের বাড়ির কাজের মেয়ে। নাম মানদা। আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার সঙ্গে শাশুড়ি যে খারাপ ব্যবহার করত সেজন্যে ভীষণ কষ্ট পেত। সমরেশ যে বদমাশ, দুশ্চরিত্র সেই খবরটা ও-ই আমাকে প্রথম দিয়েছিল।'

সুধাময় জিগ্যেস করলেন, 'মানদা কি সাক্ষি দিতে রাজি হবে?'

একটু ভেবে পারমিতা বলল, 'ও-বাড়িতে থেকে ওদের বিরুদ্ধে কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবে, আমার তা মনে হয় না।'

আস্তে মাথা নাড়েন সুধাময় চট্টরাজ।—'ঠিকই বলেছ। তবু একবার জিগ্যেস করে দেখ না। বেশিরভাগ মানুষ নিজের স্বার্থটা আগে দেখে। তবে কেউ কেউ আছে, অত হিসেব করে পা ফেলে না। যা হবার হবে, এরকম ভেবে ঝুঁকিও নেয়। মানদা সেই রেয়ার মানুষদের একজন হতেও পারে।'

পারমিতাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে। তারপর বলে, 'মানদা তো বাড়ি থেকে বেরোয় না। ওকে কনট্যাক্ট করা মুশকিল।' পরক্ষণে কিছু খেয়াল হতে বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।— 'দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আমার শাশুড়ি দু'আড়াই ঘণ্টা ঘুমোন। সেই সময়টা যত ফোন আসে, মানদা ধরে। একটু আধটু লিখতে পড়তে পারে। যারা ফোন করে তাদের নাম, ফোন নাম্বার লিখে রাখে। শাশুড়ির ঘুম ভাঙলে সেগুলো তাঁকে দেয়। আমি দুপুরে ফোন করে দেখব. ধরতে পারি কিনা।'

'ভেরি গুড।'

সুধাময় আর বসলেন না, উঠে পড়লেন। তিনি চলে যাবার পর মনোবীণা বললেন, 'আমি একটা কথা ভাবছিলাম—'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল পারমিতা। কোনও প্রশ্ন করল না।

মনোবীণা বলতে লাগলেন, 'মানদা যদি শেষ পর্যন্ত সাক্ষি দেয়, তাকে তোমার শাশুড়ি তাড়িয়ে দেবেন। তার ভবিষ্যৎ তা হলে কী হবে? এই বয়েসে ও তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে না।'

পারমিতা চুপ করে রইল। মনোবীণা মানদা সম্পর্কে আরও কী বলেন, শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

মনোবীণা বললেন, 'আমার এক ছাত্রী আছে—সুরঞ্জনা। সে কলেজে পড়ায়। তার হাজব্যান্ড একজন বড় পুলিশ অফিসার। ওরা একজন ভালো, নির্ঝঞ্ঝাট কাজের লোক খুঁজছিল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে। ওদের একটা আড়াই বছরের বাচ্চা আছে। তাকে দেখাশোনা করতে হবে। আমি বললে অনুপমরা নিশ্চয়ই রাখবে। ওরা মানুষ হিসেবে চমৎকার। মানদা ওদের কাছে ভালোই থাকবে। তোমার শ্বশুড়বাড়িতে যা মাইনে পায় তার চেয়ে মাইনেটা যাতে বেশি হয় সেদিকটা আমি দেখব। আশা করি নতুন জায়গায় কাজ নিতে মানদার আপত্তি হবে না।'

পারমিতা বুঝতে পারছিল, মানদাকে যাতে টাকাপয়সার ব্যাপারে বিপন্ন হতে না হয়, তার ভবিষ্যৎ যাতে নির্বিঘ্ন থাকে, সেসব এর মধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন মনোবীণা। মানদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তবেই তাকে আদালতে হাজির করতে চান। মনোবীণাকে যত দেখছে ততই তাঁর ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে পারমিতার।

মনোবীণা বলতে লাগলেন, 'মানদা তোমার শ্বশুড়বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে নির্ভয়ে সাক্ষি দিতে পারবে। আশা করি অনুপমদের কাছে কাজ নিতে ওর আপত্তি হবে না।'

পারমিতার শ্বশুড়বাড়িতে কাজের লোকেরা স্মৃতিরেখার ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। পান থেকে এতটুকু চুন খসলে তার আর নিস্তার নেই। এদের মানুষ বলেই মনে করেন না। সারাক্ষণ গালাগাল, অপমান। পারলে তাদের ছিঁড়ে খান। কাজের লোকেদের অনেকেরই বেশ বয়স হয়েছে। এই বয়সে স্মৃতিরেখা তাড়িয়ে দিলে কোথায় গিয়ে চাকরি পাবে? তাই মুখ বুজে চরম অপমান সয়ে পড়ে থাকতে হয়। বাইরে কোথাও কাজ পেলে তারা এক মুহূর্তও ওখানে থাকবে না।

পারমিতা বলল, 'মনে হয় মানদা নতুন জায়গায় চাকরি নিতে আপত্তি

করবে না। আপনি যখন বলছেন অনুপমবাবুরা ভালোমানুষ, তার ওপর আর কথা নেই।'

'তুমি মানদার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পার, যোগযোগ কর—'

'করব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মনোবীণা বললেন, 'আমার আরও কিছু বলার আছে।'

পারমিতা জিগ্যেস করে, 'কী?'

'সুধাময়কে তুমি বলেছ তোমার শাশুড়ি দু'জন কাজের লোককে চুরির দায়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। ওটা মিথ্যে অভিযোগ। মহিলা কারওকে বিশ্বাস করেন না। ভীষণ সন্দেহবাতিক। আমার বিশ্বাস লোকদু'টো খুবই অনেস্ট। চুরির অপবাদ দিতে তাদের কী কান্না!'

'ওরা তো যদুবাবুর বাজারের পেছন দিকে একটা হাফ বস্তি টাইপের এলাকায় থাকে?'

'হ্যাঁ।

'ওদের কী নাম?'

'অধীর আর গুপী। অধীরের দেশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। গুপী ওড়িষার লোক। তবে জন্মটন্ম সব কলকাতায়। একেবারে বাঙালি হয়ে গেছে। চুরির বদনাম দেবার পর ওদের কী কান্না! তারা আমার কাছে এসে বলেছিল, 'বৌদি, না খেয়ে মরে গেলেও আমরা অন্যের জিনিস ছুঁয়েও দেখি না, কিন্তু এমন দুন্নাম আমাদের দিলে! তুমি কি কিছুই বলবে না?' শাশুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ওদের পক্ষ নিয়ে বলি, এমন সাহস আমার ছিল না। আমি মুখ বুজে ছিলাম। মন কী যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল!' বলতে বলতে থেমে গেল পারমিতা।

মনোবীণা বললেন, 'ভাবছি অনুপমকে বলব ওদের লোক দিয়ে গুপীদের খুঁজে বার করতে। ওরা সাক্ষি দিলে কেসটা তোমার ফেভারে চলে যাবে।'

পারমিতা বলল, 'কিন্তু মাসিমা—'

'কী?'

'পুলিশ এসেছে টের পেলে গুপীরা ভীষণ ঘাবড়ে যাবে। ভাববে চুরির ব্যাপারে আমার শাশুড়ি ওদের পেছনে পুলিশ লাগিয়েছে। তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক।'

'কী?'

'আমিই ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।'

মনোবীণা একটু ভেবে বললেন, 'ঠিকই বলেছ। বস্তি টস্তির মতো জায়গা। কত ধরনের আজে বাজে লোক থাকতে পারে। তুমি মাধবকে সঙ্গে নিয়ে যেও।'

পারমিতা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মনোবীণার দিকে তাকায়। তার মতো অনাত্মীয়, উটকো একটা মেয়েকে তিনি শুধু আশ্রয়ই দেন নি, ক'দিনই বা এ-বাড়িতে সে এসেছে, এর মধ্যে তাকে দু'হাতে তিনি আগলে রেখেছেন। তার বয়সি একটি তরুণী বস্তি টস্তির মতো এলাকায় গিয়ে হয়তো অস্বস্তিতে পড়তে পারে, তাই সঙ্গে মাধবকে দিতে চাইছেন। আস্তে মাথা নাড়ল পারমিতা। — 'আচ্ছা।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'যেতে তো চাইছ, তুমি ওদের খুঁজে বার করতে পারবে তো?'

'মনে হয় পারব। যদুবাবুর বাজারের পেছন দিকটায় ওড়িয়াদের একটা পাড়া আছে। গুপী সেখানে থাকে। ওড়িয়াপাড়ায় খোঁজ করলে ওকে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। গুপী জানে অধীর কোথায় থাকে। তাকে বললে সে অধীরের কাছে আমাদের নিয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। কবে যেতে চাও?'

'ছুটির দিন হলে ভালো হয়। আসছে রবিবার যাব।'

'সেই ভালো।'

আট

পরের রবিবার সকালের দিকে ন'টার মধ্যে মাধবকে নিয়ে ভবানীপুরে চলে এল পারমিতা।

যদুবাবুর বাজার এখন গমগম করছে। বাজারটা আদ্যিকালের বিশাল বিল্ডিংয়ের ভেতরেই আটকে নেই। বাইরের ফুটপাথ জুড়েও ছড়িয়ে পড়েছে। ভিড় ঠেলে ঠেলে এগুনোই মুশকিল।

লোকজনকে জিগ্যেস করে করে ওড়িয়াপাড়ায় পৌঁছে গেল পারমিতারা। চারিদিক ভীষণ ঘিঞ্জি। শুধু ওড়িষার লোকজনই এখানে থাকে না, বাঙালি বিহারি ঝাড়খন্ডি থেকে নানা প্রদেশের মানুষও রয়েছে। সব মিলিয়ে পাঁচমেশালি পাড়া। তবে ওড়িয়ার সংখ্যাই বেশি।

খুব একটা খোঁজাখুঁজি করতে হল না। এক জায়গায় পুরোনো আমলের কিছু পাকাবাড়ি ছাড়াও টিনের চালের এবং ইটের দেওয়ালের অনেক ঘর-বাড়ি রয়েছে। সেগুলোর উলটো দিকে একটা চায়ের দোকান। সেখানে সামনের ফুটপাথে ক'টা বেঞ্চি পাতা। ঠাসাঠাসি করে বেশ কিছু খদ্দের সেগুলোর ওপর বসে কাচের গেলাসে চা এবং সস্তা বেকারির বিস্কুট বা পাউরুটি খাচ্ছে। বসার জায়গা না পেয়ে অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের হাতেও চায়ের গেলাস।

দোকানটা ছোট। একটা মস্ত কয়লার উনুনে ডেকচিতে চায়ের জল ফুটছে, পাশেই রয়েছে বড় একটা স্টেনলেস স্টিলের ক্যানে দুধ। চিনি এবং চা রাখার পাত্র। একটা লম্বা তক্তার ওপর স্তূপাকার পাউরুটি এবং সারি সারি চায়ের গেলাস।

দোকানের মালিক উনুনের ওধারে হাতলভাঙা আদিকালের চেয়ারে বসে চা তৈরি করে গেলাসে গেলাসে বোঝাই করে দিচ্ছে। একটা ছোকরা ফরমাশমতো সেই সব গেলাস খদ্দেরদের হাতে হাতে দিচ্ছে। বিরাট গামলায় একধারে জল ধরা আছে। অন্য একটি ছোকরা সেই জলে এঁটো গেলাস ধুয়ে ধুয়ে রাখছে।

মাধব বলল, 'দিদি, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি চায়ের দোকানে গে শুদোই, যদি ওরা কেউ গুপীর খপর দিতে পারে।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল পারমিতা। দোকানে গিয়ে গুপীর সন্ধান পাওয়া গেল। উলটো দিকে পুরোনো চাপ-বাঁধা টালি বা টিনের চালের যে বাড়িগুলো রয়েছে, সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দোকানদার বলল, 'ওর মধ্যে গুপী থাকে। ভেতরে ঢুকে খানিকটা গেলেই তার ঘর। যে কারওকে জিগ্যেস করলে দেখিয়ে দেবে।' সে পারমিতাকে লক্ষ করেছিল। গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলে ডাকল, 'মা, আপনি ওখানে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?' দোকানের ভেতর আরও প্ল্যাস্টিকের চেয়ার রয়েছে। সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'এখানে এসে বসুন।'

যারা চা খাচ্ছিল তাদের কৌতূহলী চোখ এসে পড়েছে পারমিতার দিকে। তাদের আধময়লা পোশাক, গালে খাড়া খাড়া দাড়ি, উষ্কখুষ্ক চুল, রোগা ক্ষয়াটে চেহারা বুঝিয়ে দেয় ওরা খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। নানা ধরনের ছোটখাটো কাজটাজ করে কোনওরকমে টিকে আছে। ওদের মধ্যে গিয়ে বসলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না পারমিতা। একটু বিব্রতভাবে সে বলল, 'আমি এখানেই দাঁড়াই।'

তার মনোভাবটা আন্দাজ করে নিল চায়ের দোকানের মালিক। সে আর কিছু না বলে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মিনিট ছ' সাতেকের বেশি দাঁড়াতে হল না। মাধব বস্তি থেকে গুপীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা। চুল আধাআধি পেকে গেছে। পরনে ময়লা ধুতি আর জামা। পারমিতাকে দেখে গুপী একেবারে অবাক হয়ে যায়। বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগে। তারপর বলল, 'বৌদিদি, আপনি এখানে! এ তো আমি ভাবতেই পারি নি।'

পারমিতা বলল, 'বিশেষ দরকারে আসতে হয়েছে। এখানে এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা হবে না। বড় রাস্তায় চল। কোথাও একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে যেজন্যে এসেছি—বলব।'

বড় রাস্তা অর্থাৎ আশুতোষ মুখার্জি রোডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পারমিতা জিগ্যেস করল, 'অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম। কেমন আছ গুপী?'

গুপী বলল, 'খুব একটা ভালো না। কোনওরকমে টিকে আছি।'

'কাজটাজ কী করছ?'

গুপী জানায়, কটক, ভদ্রক আর সম্বলপুরের অনেক লোকজন এখানে থাকে। তাদের বেশিরভাগই প্লাম্বার। ওদের কাছে জলের কলটল সারাবার কাজ শিখে আজকাল তাই করছে। একা মানুষ, সংসারে তার আর কেউ নেই। মজুরি টজুরি যা পাওয়া যায় তাতে একটা পেট চলে যায়।

পারমিতা বলল, 'অধীরও তো এই পাড়ায় থাকে।'

গুপী বলল, 'হ্যাঁ বৌদিদি। আমি যেখানে আছি সেখান থেকে খানিকটা হেঁটে গেলে একটা বস্তিতে অধীর থাকে। আমার ওখান থেকে মিনিট চারেকের রাস্তা। রোজই সন্ধের পর কাজ টাজ থেকে ফিরে এলে ওর সঙ্গে দেখা হয়। তা অধীরের সঙ্গেও কি কিছু দরকার আছে?'

পারমিতা বলল, 'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে যা দরকার, ওর সঙ্গে সেই একই দরকার। ওকে কি এখন পাওয়া যাবে?'

'না, বৌদিদি। অধীর চেতলায় একটা বড় গুদামে কাজ করে। সকালে উঠেই বেরিয়ে যায়। ফিরতে ফিরতে সন্ধে। বেস্পতিবার ওর ছুটি। এখন অধীরকে পাওয়া যাবে না।'

'ও।' একটু চুপ করে রইল পারমিতা। তারপর বলল, 'এবার দরকারি কথাটা শোন। তোমাকে আর অধীরকে কীরকম অপমান করে দারোয়ান দিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়ানো হয়েছে, আমি জানি। আমাকেও কীভাবে আমার শ্বশুড়বাড়ি থেকে দূর করা হয়েছে, তোমরাও তা জানো। এমন কি আমার ছেলেটার সঙ্গেও কোনওরকম সম্পর্ক রাখতে দেয় নি। আমি যাতে দেখা

করতে না পারি সেজন্যে তাকে অনেকদূরে কার্শিয়াং-এ একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।'

গুপীর মুখটা করুণ দেখাল। ভারী গলায় সে বলল, 'সবই জানি। আপনার ওপর দিনের পর দিন কী অত্যাচার হয়েছে, নিজের চোখে দেখেছি। কিছু মনে করবেন না বৌদিদি, আপনার শাশুড়ি আর ওই দাদাবাবু মানুষ না। আমরা না হয় চাকরবাকর, কিন্তু আপনার মতো ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে কী খারাপ ব্যবহারই না করত। শেষ অব্দি আপনাদের বিয়েটাও কাটান ছাড়ান করিয়ে ছাড়ল। অধীর আর আমি তো বটেই, ও-বাড়ির অন্য কাজের লোকেরাও, সবাই কী কষ্ট যে পেয়েছিলাম।'

জোরে একটা শ্বাস ফেলল পারমিতা। তার মুখটা হঠাৎ ভীষণ কঠোর হয়ে উঠেছে। সে বলল, 'এবার কাজের কথা বলি। আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে। এটা আমি সহ্য করব না। ওরা সোনাকে ছাড়বে না। তাই বাধ্য হয়ে কেস করতে যাচ্ছি।'

গুপী বলল, 'অধীর আর আমি নিজেদের ভেতর বলাবলি করেছি, অনেকদিন আগেই আপনার কিন্তু কেসটা করা উচিত ছিল বৌদিদি।'

'কী করে করব? আমি তখন যেখানে থাকি সেখানে সোনাকে নিয়ে রাখা যেত না। তা ছাড়া টাকারও জোর ছিল না। নিজের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। এখন একটা ব্যবস্থা হয়েছে, তাই কেসটা করতে পারব। এ-ব্যাপারে তোমার আর অধীরের সাহায্য চাই।'

গুপীর চোখদু'টো জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে বলে, 'ওদের একটা শিক্ষে দেওয়া দরকার। আপনি যা বলবেন তাই করব। আপনার শাশুড়ি আপনার ওপর কম নিয্যাতন করেচে! নিজের পেটের ছেলে, তাকে অব্দি ছিনিয়ে নিয়েচে।'

তার প্রতি সমরেশদের বাড়ির সব কাজের লোকেদের ছিল অপার সহানুভূতি। পারমিতাও তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। শাশুড়ি স্মৃতিরেখা বসু যখন এই মানুষগুলোকে উঠতে বসতে [illegible] [illegible] তার মন কী খারাপ যে হয়ে যেত! সামনাসামনি স্মৃতিরেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস তার ছিল না। তবে আড়ালে ওদের বলত, 'তোমরা পারলে অন্য কোথাও চলে যাও। এত উৎপাত কেউ সহ্য করতে পারে!' কাজের লোকেরা

বলত, 'কোথায় আর যাব! সারা জেবন এখেনেই কুকুরবেড়ালের মতো পড়ে থাকতে হবে।' পারমিতা এরপর আর কী বলবে, ভেবে পেত না। এখন গুপীর কথাগুলো শুনতে শুনতে কৃতজ্ঞতায় তার দু'চোখ বাষ্পে ভরে যাচ্ছিল।

একটু চুপচাপ।

তারপর গুপী বলল, 'এতক্ষণ তো আমাদের খবরই নিলেন। আপনি এখন কোথায় আছেন বৌদিদি? কী করছেন?'

পারমিতা সব জানাল। মনোবীণা লাহিড়ি তাকে কীভাবে মায়ের মতো আশ্রয় দিয়ে দু'হাতে আগলে রেখেছেন, তাও বলল। আরও জানাল, স্মৃতিরেখাদের বিরুদ্ধে যে কেসটা সে করতে চলেছে, তা কোনওদিন সম্ভব হত না যদি মনোবীণা না তার পাশে দাঁড়াতেন!

গুপী কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'তিনি খুব বড় মানুষ। সবাই যদি এমনটা হত।'

পারমিতার হাতে যে লেডিজ ব্যাগটা রয়েছে সেটা খুলে কাগজ আর ডটপেন বার করে তার ঠিকানা লিখে গুপীকে দিয়ে বলল, 'এখানে আমি থাকি। অধীরকে নিয়ে আমার সঙ্গে কবে দেখা করতে পারবে?'

'আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই যাব।'

'আসছে বেস্পতিবার অধীরের ছুটি। সেদিন চলে এস। উকিলবাবুকেও খবর দেওয়া হবে। কোর্টে কীভাবে কী বলতে হবে তিনি বুঝিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা—'

ব্যাগ থেকে দু'খানা একশো টাকার নোট বার করে গুপীর দিকে বাড়িয়ে দিল পারমিতা।

বিমূঢ়ের মতো তাকায় গুপী।—'টাকা কেন বৌদিদি?'

পারমিতা বলল, 'তোমরা অতটা পথ যাবে। যাতায়াতের খরচ তো আছে—'

গুপী কিছুতেই নেবে না। বৌদিদির একটা কাজে তাদের সাহায্য দরকার, এতেই তারা কৃতার্থ। অনেক বোঝানো সোঝানোর পর খুব কুণ্ঠিতভাবে টাকাটা নিল সে।

নয়

চোখের পলকে আরও দু'টো মাস শেষ হল। সময় কেটে যাচ্ছে একই নিয়মে। বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি, মনোবীণাকে সঙ্গ দান, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে যে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে তা হল সুধাময় সমরেশদের নামে ফ্যামিলি কোর্টে মামলা রুজু করে দিয়েছেন। পারমিতাকে ছেলের কাস্টোডি দিতে হবে। তবে এখনও শুনানি শুরু হয়নি।

এই মামলার ব্যাপারে গুপী এবং অধীর 'মৈনাক'-এ বেশ ক'বার এসেছে। দুপুরে মানদাকে ফোন করে মানদাকেও ডাকিয়ে আনা হয়েছে। সুধাময় আদালতে তারা কীভাবে সাক্ষি দেবে পাখি পড়ানোর মতো তার তালিমও দিয়েছেন। তা ছাড়া পারমিতার শ্বশুরবাড়ির আশেপাশের কয়েকটা বাড়ির বেশ কয়েকজন সাক্ষি দিতে রাজি হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে স্মৃতিরেখার সদ্ভাব নেই। তিনি যে পারমিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন সেটা তারা জানে। এমনকি টেলিফোনে কার্শিয়াংয়ে যে রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে সোনাকে রাখা হয়েছে তার প্রিন্সিপ্যাল ফাদার ফার্গুসনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন সুধাময়। তাঁকে বলা হয়েছে এই কেসে তাঁর সাক্ষিটা জরুরি। স্মৃতিরেখার নির্দেশে তিনি সোনার সঙ্গে তার মা অর্থাৎ পারমিতাকে যে দেখা করতে দেন না এবং এটা যে চরম নিষ্ঠুরতা—আদালতে দাঁড়িয়ে তা বলতে তিনি রাজি হয়েছেন। এর জন্য কার্শিয়াং থেকে তাঁর যাতায়াতের ভাড়া এবং কলকাতায় থাকার যাবতীয় খরচ দেবেন মনোবীণা।

স্মৃতিরেখাদের বাড়িতে থেকে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষি দেওয়া প্রায় অসম্ভব, তাই সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে মানদা অনুপমদের বাড়ি চাকরি নিয়েছে।

এর মধ্যে অনুপম এবং সুরঞ্জনা বেশ কয়েকবার 'মৈনাক'-এ এসেছে।

দু'জনেই খুব অমায়িক, মিশুকে, আমুদে। তাদের খুব ভালো লেগেছে পারমিতার। পারমিতার সঙ্গে আলাপ করে তারাও খুশি।

অন্যদিনের মতো আজও অফিস থেকে সন্ধে সাড়ে ছ'টার ভেতর বাড়ি ফিরে এল পারমিতা।

মাধব দরজা খুলে দিয়ে ত্রস্ত, চাপা গলায় বলল, 'আমাদের খুব বেপদ গো দিদিমণি।' তাকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে।

পারমিতা চমকে ওঠে।—'কী হয়েছে?'

মাধব বলল, 'মায়ের ঘরে গে দেখ। কী করব বুজতে পারচি না।'

পারমিতা আর কোনও প্রশ্ন করল না। কাঁধের ব্যাগটা ড্রইংরুমের সোফায় ছুড়ে দিয়ে একরকম দৌড়ে মনোবীণার বেডরুমে চলে এল।

মনোবীণা বিশাল খাটের মাঝখানে শুয়ে আছেন। কপালে গলায় গালে দানা দানা ঘাম। ব্লাউজও ভিজে গেছে ঘামে। চোখ বোজা। দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে। গলা থেকে মাঝে মাঝে গোঙানির মতো কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

মনোবীণার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো দাঁড়িয়ে ছিল আরতি। মাধব বাইরের দরজা বন্ধ করে চলে এসেছিল। ধরা ধরা গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হবে দিদিমণি?'

মাধবদের মতো প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল পারমিতা। মনোবীণার সারা শরীরে যেসব লক্ষণ ফুটে বেরিয়েছে তা তার চেনা। তার প্রাক্তন শ্বশুরমশাই অর্থাৎ সমরেশের বাবার একবার ঠিক এমনটাই হয়েছিল। নিশ্চয়ই মনোবীণার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। স্ট্রোক।

চকিতে পারমিতার মনে হল, এখন ভেঙে পড়লে চলবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিছানায় শায়িত বৃদ্ধা মহিলাটিই তার একমাত্র অবলম্বন। তাঁকে যেভাবে হোক, বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। তিনি বেঁচে থাকলে সে নিরাপদ। নইলে ফের অথৈ সমুদ্রে গিয়ে পড়তে হবে। ভাবনাটা হয়তো চূড়ান্ত স্বার্থপরের মতো হল কিন্তু তা শতকরা একশো ভাগ সত্যি।

লহমায় নিজেকে সামলে নিল পারমিতা। জিগ্যেস করল, 'আমি যখন অফিসে বেরুই তখন তো বেশ ভালোই ছিলেন। কখন এরকম হল?'

আরতি এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে উত্তর দিতে পারল না। ঠোঁট দু'টো থরথর কাঁপতে লাগল।

মাধব যা জানায় তা এইরকম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন মনোবীণা। বিকেলে তাঁর ঘুম ভাঙছে না দেখে পাঁচটা নাগাদ আরতি তাঁকে দেখতে যায়। তখন থেকেই এই অবস্থা চলছে।

এখন সাড়ে সাতটা। মনে মনে পারমিতা ভেবে নিল, প্রায় আড়াই ঘন্টা এইভাবে পড়ে আছেন মনোবীণা। বিনা চিকিৎসায়। ফলে হার্টের কতটা ক্ষতি হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না। এ-বাড়ির দু'জন হাউস ফিজিসিয়ান রয়েছেন। ডাক্তার রায়চৌধুরি এবং ডাক্তার দত্তগুপ্ত। ডাক্তার রায়চৌধুরি অন্য সব রোগের চিকিৎসা করেন। একসময় তিনি মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের প্রফেসর ছিলেন। ডাক্তার দত্তগুপ্ত হার্টের ব্যাপারটা দেখেন।

যেহেতু হার্ট অ্যাটাকই হয়েছে বলে পারমিতার দৃঢ় বিশ্বাস, সে আর এক লহমাও সময় নষ্ট করল না। দুই চিকিৎসকেরই ফোন নাম্বার তার জানা, মনোবীণাই তাকে জানিয়ে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সে যেন তাঁদের ফোন করে। পারমিতা দু'জনকেই চেনে। ওঁরাও তাকে চেনেন। কেননা সে এই ফ্ল্যাটে আসার পর বারকয়েক ওঁদের কল দেওয়া হয়েছিল।

পারমিতা ফোনে ডাক্তার দত্তগুপ্তকে ধরে ফেলল এবং মনোবীণার অসুস্থতার লক্ষণগুলো সংক্ষেপে জানিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে চলে আসতে বলল।

দশ মিনিটের ভেতর ডাক্তার দত্তগুপ্ত এসে পড়লেন। বুক পিঠ চোখ ইত্যাদি পরীক্ষা করে ক্ষিপ্র হাতে ইসিজি করলেন। ইসিজির লম্বা শিটে উঁচু-নীচু রেখাগুলি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে লক্ষ করে বললেন, 'মাঝারি ধরনের একটা স্ট্রোক হয়েছে। অনেক আগেই আমাকে খবর দেওয়া উচিত ছিল।'

পারমিতা বলল, 'আমি অফিস থেকে এইমাত্র ফিরেছি। মাধব আর আরতি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। খবর দিতে দেরি হওয়ায় খারাপ কিছু হবে না তো?'

'একটু তো ভুগতেই হবে।'

উৎকণ্ঠিত পারমিতা জিগ্যেস করল, 'পুরোপুরি সুস্থ হতে কতদিন লাগবে?'

ডাক্তার দত্তগুপ্ত বললেন, 'অন্তত একমাস বেড-রেস্টে থাকতে হবে। তারপর কী কী করা দরকার সব বলে দিচ্ছি।' বলে মনোবীণার হাতে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন।

মিনিট পাঁচেকের ভেতর ওষুধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল। গোঙানিটা বন্ধ হয়েছে মনোবীণার। আরও পনেরো মিনিট পর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে শুরু হল। তারও খানিকক্ষণ পর চোখের পাতা মেলে তাকালেন মনোবীণা।

পলকহীন পেশেন্টের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ডাক্তার দত্তগুপ্ত। জিগ্যেস করলেন, 'এখন কেমন ফিল করছেন?'

মনোবীণা দুর্বল গলায় বললেন, 'অনেকটা ভালো।'

'হঠাৎ কী হয়েছিল যে এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন? এনি টেনশন।

'না তো। আপনি আর ডাক্তার রায়চৌধুরি যে চার্ট করে দিয়েছিলেন ঘড়ির কাঁটা ধরে সেইমতো চলছি। এতটুকু হেরফের হয়নি। পারমিতা, মাধব আর আরতি খুব সেবাযত্ন করে। আজ বিকেলবেলা শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ বুকে মারাত্মক পেইন হল। তারপর সব ব্ল্যাক-আউট হয়ে গেল। তখন পারমিতা বাড়িতে ছিল না। খুব সম্ভব ও অফিস থেকে ফিরে আপনাকে খবর দিয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপ করে থেকে মনোবীণা বললেন, 'হার্টের কন্ডিশন অনেকদিন ধরে ভালো ছিল না। এখন বোধহয় খুব খারাপই হয়ে গেল, তাই না?'

ডাক্তার দত্তগুপ্ত বললেন, 'মাথা থেকে এই দুশ্চিন্তাটা বার করে দিন। ওটার দায়িত্ব আমার। সব ঠিক হয়ে যাবে। লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমার কথা শুনতে হবে কিন্তু।'

ম্লান হাসলেন মনোবীণা।—'সব সময়ই তো শুনি। কোনওদিন কি অবাধ্য হয়েছি?'

ডাক্তার দত্তগুপ্ত এবার প্রেসক্রিপশন লিখে ফেললেন। জানালেন, আপাতত দিন পনেরোর জন্য একজন চব্বিশ ঘণ্টার ট্রেন্ড নার্স রাখতে হবে। তা ছাড়া তাঁর লোক এসে রোজ দু'বেলা দু'টো ইঞ্জেকশন দিয়ে যাবে। চাররকম ওষুধ লিখে দিয়েছেন। নিয়ম করে সময়মতো খেতে হবে। আর

যেটা সবচেয়ে ইমপর্টান্ট ব্যাপার, একটা মাস কোনও মতেই বিছানা থেকে নামা চলবে না। স্নান-খাওয়া—সব কিছু বিছানাতেই।

স্ট্রোকের এতবড় ধাক্কায় ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছেন মনোবীণা। তবু মজার গলায় বললেন, 'ডক্টর ইউ আর ভেরি ক্রুয়েল টু মি।. হাত-পা ডানা-টানা ছেঁটে একেবারে পঙ্গু করে দিলেন।'

ডাক্তার দত্তগুপ্ত হাসলেন।—'ক'টা তো দিন। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু যা বললাম, ঠিক সেইমতো চলতে হবে।'

'দেখুন ডক্টর, এতদিন অসুখ-বিসুখ হয়েছে। উইক হার্ট নিয়ে কাটিয়েছি। নিজের ওষুধ নিজে খেয়েছি। আরতি আর মাধব আমার দেখাশোনা করেছে। পারমিতা আসার পর অবশ্য বেশির ভাগ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সে। নার্সের সেবাটেবা আমার পছন্দ নয়। বাড়িতে উটকো একটা ঝামেলা। কী যে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে পারমিতা হঠাৎ বলে ওঠে, 'নার্সের দরকার নেই। আমিই মাসিমাকে দেখব। আমার মা যখন ভীষণ অসুস্থ, রোগে শয্যাশায়ী, আমি তাঁকে নার্সিং করেছি।'

পারমিতা সম্পর্কে সবই জানেন ডাক্তার দত্তগুপ্ত। বললেন, 'কিন্তু তোমার অফিস আছে। ন'দশ ঘণ্টার মতো বাইরে থাকবে। সেই সময়টা কে ওঁকে দেখবে?'

'আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে। আমি একমাস ছুটি নিয়ে নেব।'

মনোবীণা বললেন, 'পারমিতা আমার দেখাশোনার ভার নিলে, নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

ডাক্তার দত্তগুপ্ত তবু একটু খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, 'এসব ট্রেন্ড নার্সের ব্যাপার। পারমিতার তো সেরকম কোনও ট্রেনিং নেই।'

মনোবীণা জোর দিয়ে বললেন, 'না থাক। ও ঠিক পারবে।'

'বেশ। আপনার যখন তাই ইচ্ছে—'

দশ

একটানা পুরো একমাসের ছুটি পাওয়া গেল না। প্রথমে দু'সপ্তাহ, তারপর তিনদিন কাজ করার পর আরও দু'সপ্তাহ—এইভাবে ছুটি মঞ্জুর হল। এসব মনোবীণাকে জানাল না পারমিতা। দু'সপ্তাহ তো কাটুক। তার মধ্যে মনোবীণা নিশ্চয়ই অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠবেন। মাঝখানের তিনটে দিন আরতি আর মাধবকে কী করণীয়, খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেবে সে, নিশ্চয়ই ওরা সামলে নিতে পারবে। তারপরের দু'সপ্তাহ তো হাতে রইলই।

ছুটি নেবার পর প্রায় সারাটা সময় মনোবীণার ঘরেই কেটে যায় পারমিতার। সে তাঁকে মুখ ধুইয়ে দেয়, গা স্পঞ্জ করে, চুল বেঁধে দেয়, সময়মতো ওষুধ দেয়, চারবেলা নিজের হাতে খাওয়ায়। বিছানাতেই পায়খানা, পেচ্ছাপ। ডাক্তার দত্তগুপ্ত যেমন যেমন বলেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে চলে। সে যেন প্রতিজ্ঞা করে বসেছে, যেভাবে হোক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনোবীণাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলবে।

মনোবীণা অভিভূত। এমন সেবাযত্ন জীবনে কখনও আর কারো কাছে থেকে পেয়েছেন কিনা, তাঁর মনে পড়ে না। আজকাল তিনি পারমিতাকে তুমি করে বলেন না, নিজের অজান্তে কবে থেকে তুই বলছেন, খেয়াল নেই। তিনি মাঝে মাঝেই তাড়া দেন, 'একটা রোগীর কাছে দিনরাত পড়ে থাকিস। অসুস্থ হয়ে পড়বি যে। যা, বাইরে থেকে একটু ঘুরে-টুরে আয়।'

পারমিতা কোথাও যায় না। মনোবীণার পাশে একটা চেয়ারে অনড় বসে থাকে।

মনোবীণার দূর সম্পর্কের দু'চারজন আত্মীয়স্বজন এই শহরে রয়েছেন। খবর পেয়ে তাঁদের কেউ কেউ এসে দেখে গেলেন। কলেজে তাঁর বেশিরভাগ কলিগই বেঁচে নেই। যাঁরা এখনও জীবিত, অবসরের পর তাঁদের

কেউ কেউ ছেলে বা মেয়ের কাছে বাঙ্গালোর কি দিল্লিতে চলে গেছেন। একজনই মাত্র কলকাতায় আছেন। তিনি আরথ্রাইটিসে প্রায় পঙ্গু। তবু তারই মধ্যে একদিন পুরোনো সহকর্মীকে দেখে গেছেন।

তবে সবচেয়ে বেশি আসছে হরীশ টোডি। সে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। যখনই আসে, বলে, 'মাসিমা. ডক্টর দত্তগুপ্ত ভালো ডাক্তার জানি। তবু আমার মনে হয় আপনার কোনও নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়া উচিত।' সে কলকাতার ক'টা বিখ্যাত প্রাইভেট হাসপাতালের নাম করে জানায় মনোবীণা রাজি হলেই অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করে ফেলবে।

নিরুৎসুক সুরে মনোবীণা বলেন, 'কোনও প্রয়োজন নেই।'

হরীশ টোডি নাছোড়বান্দা। একদিন সে বলল, 'তা হলে বরং এক কাজ করা যাক, ভেলোরে আমার জানাশোনা স্পেশালিস্ট আছেন। ওঁদের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা কলকাতার চেয়ে অনেক ভালো। বলেন তো আপনাকে নিয়ে যাব।'

'আমাকে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।'

মুখটা যতটা সম্ভব করুণ করে হরীশ টোডি বলে, 'দুশ্চিন্তা হবে না—এ আপনি কী বলছেন? আমি আপনার ছেলের মতো।'

চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল পারমিতা। এই লোকটাকে সে আদৌ পছন্দ করে না। নিজের অজান্তেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'উনি যখন চাইছেন না, কেন ওঁকে বিরক্ত করছেন?'

এই ফ্ল্যাটে পারমিতাকে প্রথম দেখার পর থেকেই তার প্রতি একটা চাপা বিদ্বেষ জমা হতে শুরু করেছে হরীশের মধ্যে। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই তরুণী তার রক্তচাপ ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এতদিন শীতল চোখে সে তাকে লক্ষ করে গেছে শুধু ; পারমিতার সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। আজ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'হু আর ইউ? ইউ আর অ্যান ইনট্রুডার ইন দিস ফ্ল্যাট। আমরা কথা বলছি। তার মধ্যে আপনি নাক গলাচ্ছেন কেন?'

অপমানে মুখ লাল হয়ে ওঠে পারমিতার। সে গলা চড়িয়ে হইচই বাধিয়ে দিতে পারত। কিন্তু অসুস্থ একটি মানুষের ঘরে চেঁচামেচি করতে ইচ্ছা হল না। মেজাজটাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই মনোবীণা বললেন, 'হরীশ, তোমাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিচ্ছি, পারমিতা ইনট্রুডার

নয়, তাকে আমিই এখানে এনেছি। সে আমাদের একজন ফ্যামিলি মেম্বার। আমার সম্বন্ধে যা করার, যা বলার ও-ই বলবে, ও-ই করবে। শী ইজ দা ফাইনাল অথরিটি।'

জবাব না দিয়ে ঠাণ্ডা, হিংস্র দৃষ্টিতে পারমিতার দিকে তাকাল হরীশ টোডি। এতদিন আবছা ভাবে টের পাচ্ছিল, আজ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল, লোকটার মধ্যে একটা মারাত্মক শ্বাপদ লুকিয়ে আছে। যে-কোনও মুহূর্তে সেটা দাঁত-নখ উঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল পারমিতার।

ধীরে ধীরে দুই চোখ মনোবীণার দিকে ফিরিয়ে হাসি হাসি মুখে হরীশ বলল, 'ঠিক আছে মাসিমা, পারমিতাদেবী যখন এ-বাড়ির অথরিটি তখন আর কিছু বলব না। তবে—'

'কী?'

'হঠাৎ এমন একটা অসুখে পড়ে গেলেন, একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হচ্ছে। খবরটা আপনার ছেলে মানে সুব্রতকে সবার আগে দেওয়া উচিত ছিল। দিয়েছেন কী?'

মনোবীণার রোগমলিন মুখ আরও একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'না, দেওয়া হয়নি। এ-নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সময়মতো ওকে জানিয়ে দেব।'

আর কোনও প্রশ্ন করল না হরীশ টোডি।—'আচ্ছা, আজ তা হলে চলি। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।' সে উঠে দাঁড়াল। তারপর জ্বলন্ত চোখে একবার পারমিতার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মনোবীণা বললেন, 'যে-ছেলে মাকে ভুলে গেছে, সেই কবে একবার ফোন করেছিল, তাকে খবর দিয়ে কী হবে?' তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে অভিমান এবং অসন্তোষ ফুটে উঠতে লাগল।

পারমিতা উত্তর দিল না. নীরবে বসে রইল।

এগারো

দেখতে দেখতে দু' সপ্তাহ কেটে গেল। হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার দত্তগুপ্ত ছাড়াও এ-বাড়ির অন্য হাউস ফিজিসিয়ান অর্থাৎ ডাক্তার রায়চৌধুরিও রয়েছেন। তাঁরা একরকম পালা করে মনোবীণাকে দেখে গেছেন। ধীরে ধীরে হার্ট অ্যাটাকের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে লাগলেন তিনি।

দু'সপ্তাহ পর তিনদিন অফিসে যেতে হবে পারমিতাকে। সে যে কয়েক ঘণ্টা ফ্ল্যাটে থাকবে না সেই সময় কখন কখন মনোবীণাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে, স্নান করাতে হবে, কখন দুপুরের এবং বিকেলের খাবার দিতে হবে— সব আরতি এবং মাধবকে বুঝিয়ে দিয়ে অফিসে গেল সে।

এই তিনদিনের মধ্যে দু'টো দিন মসৃণভাবে কেটে গেল। পারমিতার কথামতো ঘড়ির কাঁটা ধরে আরতিরা মনোবীণাকে ওষুধ খাইয়েছে, খাবার খাইয়েছে, সেবাযত্ন করেছে।

অফিস থেকে ফিরে এসে পারমিতা এই দু'দিন জিগ্যেস করেছে, 'আপনার কোনও অসুবিধা হয়নি তো?'

মনোবীণা হেসেছেন, 'একেবারেই না। আরতি আর মাধবকে যেভাবে ট্রেনিং দিয়েছ, তারা রোবোটের মতো কাজ করে গেছে। অসুবিধে হবার উপায় আছে?'

তৃতীয় দিন কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল।

মনোবীণার জন্য কিছু নতুন ওষুধ আর ইঞ্জেকশনের অ্যামপুল কিনে নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তার দত্তগুপ্তর প্রেসক্রিপশন সঙ্গে করে এনেছিল পারমিতা।

তাদের অফিস থেকে একটু দূরে একটা বিশাল ওষুধের দোকান। দোকানটায় সবসময় প্রচণ্ড ভিড়। ছুটির পর সেখানে চলে গেল পারমিতা।

ওষুধ-টোষুধ কিনে যখন পারমিতা বেরুল প্রায় সাতটা বাজে। অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। বাসে করে গেলে আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে যাবে।

এত দেরি তার কখনও হয় না। নিশ্চয়ই মনোবীণা খুব চিন্তা করছেন। তা ছাড়া সে না ফিরলে আরতি আর মাধব বাড়ি যেতে পারবে না। মনোবীণার এখন শারীরিক অবস্থা তাতে তাঁকে একা ফেলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়।

পারমিতা ট্যাক্সির জন্য এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল। এই সময় কলকাতার এই যানটি পাওয়া লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার মতোই ব্যাপার। কিন্তু ভাগ্যই বলতে হবে, দু'মিনিট দাঁড়াতেই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে গেল পারমিতা। উঠতে যাবে, হঠাৎ কাছাকাছি একটা টাটা সুমো এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সেটা থেকে নেমে এল সুরজিৎ রাহা। কুটিল হেসে সে বলে, 'তিন সাড়ে-তিন বছর খুব খেলিয়েছ। কিন্তু একই শহরে থাকি। কলকাতা যত বড় মেট্রোপলিসই হোক, আমি জানতাম একদিন না একদিন আমাদের দেখা হবেই।'

এই ভয়টাই করছিল পারমিতা। ত্রাসে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার। এত করেও লোকটাকে এড়ানো যায়নি।

সুরজিৎ বলল, 'এবার থেকে আশা করি রেগুলারলি আমাদের দেখা হবে। তোমার ঠিকানাটা কি দেবে?'

উত্তর না দিয়ে দ্রুত ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল পারমিতা। ড্রাইভারকে বলল, 'এক্ষুনি স্টার্ট দিন।' 'নিউ আইল্যান্ড'-এর নামটা জানিয়ে বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন, আমাকে পৌঁছে দিন।'

ট্যাক্সি দৌড় শুরু করল।

পেছন থেকে সুরজিতের গলা ভেসে এল, 'ঠিকানাটা দিলে আমার কাজটা ইজি হত। যাই হোক, একবার যখন দেখা হয়েছে, ঠিক খুঁজে বার করে ফেলব।'

সুরজিৎ টাটা সুমোতে ওঠার আগেই পারমিতাদের ট্যাক্সি সামনের একটা বাঁক ঘুরে তার নাগালের বাইরে চলে গেল।

বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল পারমিতার। একবার যখন সুরজিৎ তাকে দেখতে পেয়েছে, তার রেহাই নেই। সারা কলকাতা চষে সে তাকে খুঁজবেই। বেশ কয়েকবার নানা কৌশলে তাকে ফাঁকি দিয়ে উধাও হয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লম্পট জন্তুটাকে এড়ানো কি সম্ভব হবে?

ভাবতে ভাবতে উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল পারমিতার। আচমকা অনুপমের মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনোবীণা অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ; দু-একদিন পর তাঁকে সুরজিতের কথা জানাবে সে। তিনি নিশ্চয়ই অনুপমকে সুরজিতের ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিতে বলবেন, এ-বিশ্বাস পারমিতার আছে। সুরজিতের অফিসের ঠিকানা তার জানা। অনুপম সেখানে গিয়ে বা তার ডিপার্টমেন্টের কোনও অফিসারকে পাঠিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলে বদমাশ জানোয়ারটা ভবিষ্যতে আর তাকে উত্যক্ত করতে সাহস করবে না। মনটা খানিকটা হালকা হয়ে গেল পারমিতার। তবে যতক্ষণ না অনুপম কিছু করছে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।

'মৈনাক-এ ফিরতেই চোখে পড়ল মাধব আর আরতির চোখেমুখে কেমন একটা অস্থির অস্থির ভাব। বার বার তাদের চোখ ড্রইংরুমের ঘড়ির দিকে চলে যাচ্ছে।

পারমিতাকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো একটা ভঙ্গি করে আরতি বলল, 'যাক দিদিমণি, তুমি এইসে গেচ। সন্দেয় সন্দেয় (সন্ধেয় সন্ধেয়) ফিরে যাই তো। এতক্ষণ আমাকে না দেকে ছোট বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে লিচ্চয় বাড়ি মাথায় কইরে ফেলেচে। বড় মেইয়েটা তারে সামলাতে পারচেনি। মাকে তোমার কতামতো আমি আর মাধবদাদা দেকাশুনা করিচি। আর থাকতে পারবনি। যাচ্চি গ—'

মাধব এবং আরতি চলে গেল। আর পারমিতা সোজা মনোবীণার বেডরুমে গিয়ে ঢুকল।

মনোবীণা বললেন, 'তোমার আজ এত দেরি হল যে? সেই সাতটা থেকে বার বার ঘড়ি দেখছি।'

ওষুধ কিনতে যাওয়ার জন্য দেরি হয়েছে সেটা সংক্ষেপে জানাতে জানাতে ব্যাগের ভেতর থেকে ওষুধ বার করে জায়গামতো সাজিয়ে রাখল পারমিতা।

মনোবীণা বললেন, 'যাও, হাতমুখ ধুয়ে চেঞ্জ করে এস।'

পনেরো মিনিট পর পারমিতা ফিরে এল। গায়ে ঘরে পরার পোশাক। অফিসেই বিকেলের টিফিনটা খেয়ে নেয় সে। বাড়ি ফিরে সন্ধেবেলায় শুধু

এক কাপ চা। বিকেলের পর মনোবীণা আর চা খান না। পারমিতা মনোবীণার পাশে বসে তাঁকে সঙ্গ দিতে দিতে একাই খায়। তার জানা আছে, খাওয়ার টেবিলে একটা ছোট ফ্লাস্কে চা করে রেখে গেছে আরতি। কিন্তু সেটার কথা খেয়াল রইল না।

মনোবীণা জিগ্যেস করলেন, 'কী হল, তোমার চা আনলে না তো?'

'এখন আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না।' বলে পারমিতা রোজকার মতো জিগ্যেস করল, 'আরতিরা ঠিকমতো ওযুধ আর খাবার-টাবার খাইয়েছে তো?' আরতির মুখে শোনার পরও প্রশ্নটা করল সে। রোজই করে।

'তোমাকে ওরা যা ভয় পায়, না খাইয়ে রক্ষা আছে?' মনোবীণা হাসলেন। তারপর বললেন, 'না, না, ওরাও আমাকে খুব ভালোবাসে। যথেষ্ট যত্ন করে।'

সুরজিৎকে দেখার পর থেকে পুরোনো ত্রাসটা কিছুটা কাটলেও পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায় নি। মনোবীণার সঙ্গে কথা বলছে ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি রয়েই গেছে।

খাটের পাশে রয়েছে একটা চেয়ার এবং নীচু একটা টেবল। টেবলে রয়েছে 'মহাভারত'। সেই যে সেদিন এই বইটি পড়া শুরু হয়েছিল, এখনও তা চলছে। রোজই অফিস থেকে ফিরে পড়ে শোনায় পারমিতা। মাঝখানে কয়েকদিন মনোবীণাও যখন খুবই অসুস্থ সেই ক'টা দিন শুধু বাদ গেছে।

ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল সে। অন্যদিন কলকল করে কত কিছু বলে। প্রথম দিকের সেই আড়ষ্টতা কবেই কেটে গেছে। আজ কিন্তু বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।

সামান্য দু'একটা কথা বলে পারমিতা জিগ্যেস করল, 'এখন কি 'মহাভারত' শুনবেন?'

মনোবীণা হাসলেন, 'শোনাও—'

এর আগে খুব মগ্ন হয়ে পড়ে যেত পারমিতা। আবেগে, উচ্ছ্বাসে, কখনও গভীর বিষাদে তার কণ্ঠস্বর ওঠানামা করত। আজ যান্ত্রিকভাবে পড়ে চলেছে।

মনোবীণা তাকে লক্ষ করছিলেন। বুঝতে পারছেন পারমিতার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত অস্থির, চোখমুখ কেমন যেন শুকনো শুকনো। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার শরীর কি খারাপ হয়েছে?'

পারমিতা চমকে উঠল।—'কই, না তো। আমি ভালো—ভালোই আছি।'

'তা হলে তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?'

আজ সে ভেতরে ভেতরে অস্থির এবং ত্রস্ত, সেটা কি মনোবীণা ধরে ফেলেছেন? নিজেকে স্বাভাবিক রাখার জন্য জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।—'বিশ্বাস করুন মাসিমা, আমার কিছু হয়নি। এবার পড়ে যাই?'

'আজ মহাভারত থাক।' মনোবীণা বললেন, 'আমার কাছে গোপন যখন করতে চাইছ, জোর করব না। যদি কখনও বলতে ইচ্ছা হয় বোলো।'

পারমিতা একবার ভাবল সুরজিতের ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়। পরক্ষণে মনে হল, মনোবীণা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তার অনেক দায়িত্বও নিয়েছেন। এখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ, স্বাভাবিক নন। এই অবস্থায় নতুন একটা সংকটের কথা বলে তাঁকে বিচলিত বা উত্তেজিত করে তোলা ঠিক নয়। উত্তেজনা মনোবীণার হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। পারমিতা মনে মনে ঠিকই করে রেখেছে, আরও কয়েকদিন পর সুরজিতের ব্যাপারটা বলবে। সে চুপ করে রইল।

স্ট্রোক হওয়ার পর বিছানাতেই শুয়ে খান মনোবীণা। ডাক্তারের দেওয়া ডায়েট চার্ট অনুযায়ী সাড়ে আটটা দু'খানা শুকনো টোস্ট, চিকেন সুপ, শসা আর সরতোলা এক কাপ দুধ তাঁকে খাওয়াল পারমিতা। তারপর রাতের জন্য নির্দিষ্ট তিনটে ট্যাবলেট খাইয়ে কিছুক্ষণ তাঁর পাশে বসে অন্যদিনের মতো মাথায় পিঠে এবং পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তিনটে ট্যাবলেটের মধ্যে একটা তেজী ঘুমের ওষুধ রয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন মনোবীণা। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল পারমিতা। হট কেস থেকে খাবার বার করে সামান্য একটু খেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুল ঠিকই, কিন্তু সে জানে, আজ রাতে সে ভালো করে ঘুমোতে পারবে না।

বারো

মাঝখানে তিনদিন অফিস করার পর ফের দু'সপ্তাহ টানা ছুটি। চোদ্দটা দিন পারমিতাকে বাইরে বেরুতে হবে না। সুরজিতের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। এটুকুই যা স্বস্তি। তার মধ্যে কী করতে হবে, সেটা সে ঠিকই করে রেখেছে। সুযোগ বুঝে মনোবীণাকে সব জানাবে। মনোবীণা নিশ্চয়ই তক্ষুনি অনুপমকে ডাকিয়ে পাঠাবেন।

এই পর্বের ছুটির প্রথম দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। কিন্তু তার পরের দিন দুপুরে নিজের হাতে পারমিতা মনোবীণাকে যখন লাঞ্চ খাওয়াচ্ছে, হঠাৎ ডোর-বেল বেজে উঠল।

মনোবীণা জিগ্যেস করলেন, 'এ সময় আবার কে এল?'

তাঁর কথা শেষ হতে না-হতেই মাধবের উল্লসিত হইচই ভেসে এল।— 'মা, দাদাবাবু এয়েচেন।'

মনোবীণা চকিত হয়ে উঠলেন। গলার স্বর সামান্য উঁচুতে তুলে বললেন, 'কার কথা বলছিস?'

'আমাদের দাদাবাবু। ওই যে বিলেতে থাকেন—'

'তোর দাদাবাবু তো আমেরিকায় থাকে।'

'ওই হল।' মাধবের কাছে বিলেত আর আমেরিকা একই।

সারা শরীরে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিল মনোবীণার। তিনি বসে বসে খাচ্ছিলেন। খাট থেকে নামার জন্য পা বাড়ালেন। পারমিতা নামতে দিল না।

ততক্ষণে ঘরের দরজার সামনে যে এসে দাঁড়াল তার বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। দারুণ সুপুরুষ।

পারমিতা অনুমান করে নিল এ নিশ্চয়ই সুব্রত; মনোবীণার আমেরিকাবাসী একমাত্র সন্তান।

এদিকে মনোবীণার পা থেকে মাথা অবধি ভীষণ কাঁপতে শুরু করেছে। হয়তো আনন্দে, হয়তো উত্তেজনায় কিংবা প্রবল আবেগে। কতদিন পর ছেলেকে দেখলেন তিনি। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'ভেতরে আয়।'

জুতো খুলে ঘরে এসে খাটের একধারে বসল সুব্রত। বলল, 'তোমার যে

এত বড় একটা অসুখ হয়েছে আমাকে জানাওনি কেন?'

ছেলের প্রতি দুরন্ত অভিমানে যে জানাননি সেটা আর বললেন না মনোবীণা। হঠাৎ কী খেয়াল হতে অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আমেরিকায় বসে আমার অসুখের কথা তুই জানলি কী করে?'

'হরীশ টোডি আমাকে ফোন করে বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটি নিয়ে চলে এসেছি। তোমাকে একা একা আর এখানে থাকতে দেব না। এবার আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।'

পাশে বসে শুনতে শুনতে বুকের ভেতর শিহরণ খেলে গেল পারমিতার। অদ্ভুত এক ত্রাসে সারা শরীর কাঁপছে। এতক্ষণ নীরব ছিল সে। ঢোক গিলে, শুকনো মুখে বলল, 'মাসিমার শরীরের যা হাল, এই অবস্থায় কি অতদূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? ডাক্তাররা বোধহয় পারমিশন দেবেন না।'

কয়েক লহমা পারমিতাকে লক্ষ করল সুব্রত। তারপর মনোবীণার দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, 'ইনি কে? এঁকে তো চিনতে পারলাম না।'

পারমিতার সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দিলেন মনোবীণা। বললেন, 'এই মেয়েটার জন্যেই বেঁচে গেছি। কী সেবাযত্ন করে যে ও আমাকে সুস্থ করে তুলেছে, তুই ভাবতে পারবি না।'

অবেগহীন, কিছুটা বা রূঢ় স্বরে সুব্রত বলল, 'একটি মহিলার কথা হরীশ টোডির কাছে শুনেছি। তাহলে উনিই সেই পারমিতা দত্ত?'

হরীশ সুব্রতর কানে যে প্রচুর বিষ ঢেলেছে, বলার ভঙ্গিতেই তা আঁচ করতে পারল পারমিতা। কী বলেছে লোকটা? সে বয়স্কা, রোগগ্রস্ত মনোবীণাকে বশ করে কৌশলে এই ফ্ল্যাট এবং তাঁর সব সম্পত্তির দখল নিতে চায়?

সুব্রত পারমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা সুস্থ হলে ডাক্তারদের অ্যাডভাইস মতো আমেরিকায় নিয়ে যাব। আপনাকে এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

মনোবীণা সুব্রতকে জিগ্যেস করলেন, 'নিয়ে তো যাবি, এই ফ্ল্যাটের কী হবে?'

'পরে ভাবা যাবে। আপাতত বন্ধ থাকবে। তেমন বুঝলে বিক্রি করে দেব। হরীশ কিনতে রাজি আছে।'

পারমিতা এবং মনোবীণা বুঝতে পারলেন দারুণ একটা চাল দিয়েছে হরীশ। অসুখের কথা জানিয়ে সুব্রতকে কলকাতায় টেনে এনেছে। মনোবীণা কলকাতা থেকে চলে গেলে এখানকার প্রপার্টি রাখার মানে হয় না। হরীশ ফ্ল্যাটটা কেনার মোটামুটি একটা ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন।

কেউ যদি ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে চলে যায় পারমিতার বলার কী আছে?

সে নিঃশব্দে বসে থাকে। যে ত্রাসটা তার বুকের ভেতর ক'দিন ধরে চাপ সৃষ্টি করছিল সেটা হঠাৎ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

ছেলেকে দেখার পর এতকালের পুঞ্জীভূত অভিমান, রাগ এবং অসন্তোষ বিলীন হয়ে গেছে মনোবীণার। তিনি সুব্রতকে বললেন, 'সেই ভালো। তুই আমাকে নিয়েই যা।'

মনোবীণার আমেরিকা যাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। ডাক্তার দত্তগুপ্ত এবং ডাক্তার রায়চৌধুরিও জানিয়েছেন খুব সাবধানে মনোবীণাকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুখের কথা খসালেই তো অন্য কোনও দেশে যাওয়া যায় না। তার জন্য পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে সুব্রত।

এদিকে আতঙ্কটা চারিদিক থেকে যেন ঠেসে ধরতে শুরু করেছে পারমিতাকে। মনোবীণা চলে গেলে কী হবে তার? কোথায় এমন নিরাপদ জায়গা যেখানে সে পা রাখতে পারে?

সুব্রত আসার পর চারদিন কেটে গেল। পঞ্চম দিন রাত্রিবেলা মনোবীণাকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে নিজের ঘরে এসে নিজের অনন্ত দুর্ভাবনাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না পারমিতা। অঝোর কান্নার মধ্যে সেটা ফেটে বেরিয়ে এল।

পাশের ঘরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মনোবীণার। তিনি দেওয়াল ধরে ধরে পারমিতার বেডরুমে চলে আসেন। আলো জ্বেলে তার পাশে বসে বলেন, 'কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?'

আজ আর গোপন রাখা গেল না, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সুরজিতের কথা বলে গেল। তারপর ঝাপসা গলায় জিগ্যেস করল, 'ছেলেকে নিজের কাস্টোডিতে পাওয়ার জন্যে আপনার কথায় কেস শুরু করেছি। ওদিকে সুরজিৎ। আপনি আমেরিকায় চলে গেলে আমি কী করব? কে আমাকে দেখবে?' একটু থেমে বলল, 'আমি যে একেবারে ভেসে যাব।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন মনোবীণা। তারপর নরম হাতে আলতো করে পারমিতার পিঠে চাপড় দিতে দিতে মনোবীণা বললেন, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও। এখন ঘুমোও।'

পরদিন মনোবীণা ছেলেকে তাঁর ঘরে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'পাসপোর্ট ভিসার জন্যে তোকে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না। আমার আমেরিকা যাওয়া হচ্ছে না। বাকি জীবনটা কলকাতাতেই কাটিয়ে দেব।'